হযরত মুহাম্মদ [সাঃ]

আমাদের বিপ্লবের নকশা

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

হযরত মুহাম্মদ [সাঃ] আমাদের বিপ্লবের নকশা

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

মুহাদ্দিস, দারুল উলূম, রামপুরা ঢাকা, খতীব, সি.এন্ড.বি. স্টাফ কোয়ার্টার জামে মসজিদ, তেজগাঁও, ঢাকা

প্রকাশনায় : নাদিয়া বুক কর্ণার ▪ [স্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল : ৩০-৭-২০০৬ইং ▪ প্রচ্ছদ : নাজমুল হায়দার, দি লাইট

মূল্য ঃ ৭০ টাকা মাত্র।

www.almodina.com

কিছু কথা

'আদর্শ' শব্দটা আজ সমাজে বড় বেমানান। সমাজের সর্বক্ষেত্রে তার উল্টো বিদ্যমান। চোখ খুললেই অনিয়মের পাহাড়। এ অনিয়ম থেকে বের হওয়ার একমাত্র উপায়, আমাদের প্রিয় নবীর আর্দশের অনুসারী হওয়া।
আমাদের প্রিয় লেখক মাওলানা যাইনুল আবিদীন রচিত **'হযরত মুহাম্মদ [সাঃ] আমাদের বিপ্লবের নকশা'** পাঠক! বইটি দৈনন্দিন জীবনে পথ দেখাবে সুন্দরের।

মুহাম্মদ মাসউদুল হাছান

নাদিয়া বুক কর্ণার

www.almodina.com

উৎসর্গ

আমার প্রিয়
সীরাত-গবেষক, পৃথিবীখ্যাত তাফসীরকার
হযরত মাওলানা ইদরীস কান্ধালবী (রহ.)
এর রূহানী ফয়েয লাভের আশায়।

আবিদীন

www.almodina.com

সূচি পত্র

www.almodina.com

কিছু কথা

'আদর্শ' শব্দটা আজ সমাজে বড় বেমানান। সমাজের সর্বক্ষেত্রে তার উল্টো বিদ্যমান। চোখ খুললেই অনিয়মের পাহাড়। এ অনিয়ম থেকে বের হওয়ার একমাত্র উপায়, আমাদের প্রিয় নবীর আর্দশের অনুসারী হওয়া।
আমাদের প্রিয় লেখক মাওলানা যাইনুল আবিদীন রচিত **'হযরত মুহাম্মদ [সাঃ] আমাদের বিপ্লবের নকশা'** পাঠক! বইটি দৈনন্দিন জীবনে পথ দেখাবে সুন্দরের।

নাজমুল হায়দার

২৯ জুলাই ০৬

নাদিয়া বুক কর্ণার

www.almodina.com

সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলো আমার সর্বাধিক প্রিয় প্রসঙ্গ। সীরাত বিষয়ে এক যুগেরও বেশী সময় ধরে যেসব প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছি তার-ই একটি নির্বাচিত সংকলন এই গ্রন্থ। আমি যখন ভাবি, আমার জীবন সমাজ পৃথিবী নিয়ে ভাবতে গিয়ে যখনই অসংগতি পাই কিংবা বাস্তব জীবনে যখনই যেখানেই দেখি দ্বন্দ্ব-সংঘাত আমি তার সমাধান খুঁজতে সচেষ্ট হই আমার প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম জীবনচিত্রে, তাঁর বাণী শিক্ষা ও আদর্শে! এই গ্রন্থে চয়িত রচনাগুলো আমার সে অনুসন্ধানেরই ফসল। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের যাপিত জীবনে যেখানে যতটুকু লয়, পতন ও অসুন্দর আছে তার একমাত্র কারণ সেখানে আমরা আমাদের নবীর আদর্শকে উপেক্ষা করেছি। তাঁর পবিত্র শিক্ষা ও আদর্শের যতটুকু ছেড়েছি আমরা আমাদের জীবনে ততটুকুই ডুবেছি। এই বিশ্বাসটাও পেয়েছি এই সীরাত থেকেই। পাঠকগণ যদি লেখাগুলো পড়ে এমন একটি বিশ্বাস লাভে সক্ষম হোন তাহলেই আমি আমার শ্রমকে স্বার্থক মনে করব।

দু'আর মুহতাজ
মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
৩০.৭.২০০৬ঈ.
ঢাকা॥

www.almodina.com

হযরত মুহাম্মদ (সা.) : আমাদের বিপ্লবের নকশা

সকল প্রশংসা মহিমাময় আল্লাহর- যিনি মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রের পূর্ণাঙ্গ শাশ্বত বিজয়ী নির্দেশনারূপে 'দীনে ইসলাম'কে মনোনীত করেছেন; সালাত ও সালাম প্রিয়তম হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যিনি তাঁর জীবনের সকল মর্যাদা প্রতিষ্ঠা সুখ স্বপ্ন আনন্দ বিলাসকে তিলে তিলে বিলিয়ে দিয়ে বরং বর্ণনাতীত জুলুম পীড়ন ও নির্যাতনের মধ্য দিয়ে নির্মাণ করে গেছেন পবিত্র ইসলামের একটি বাস্তব ও পরিপূর্ণ রোডম্যাপ; অফুরন্ত রিযা রহমত ও করুণা বর্ষিত হোক সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈনসহ বিগত কালের সকল আকাবির ও আসলাফের প্রতি শত ত্যাগ কুরবানী ও সংগ্রামের বিনিময়ে যাঁরা যুগের পর যুগ ধরে মানব ও মানবতার সকল কালের সকল ক্ষেত্রের এই অবিনাশী মুক্তিবারতা দীনে ইসলামকে জিইয়ে রেখেছেন। ফলে আমরা পেয়েছি বাঁচার পথ, নাজাতের ঠিকানা!

এতে কোন সন্দেহ নেই, কিয়ামতাবধি আগতব্য মানব জাতির বিজয় ও সফলতা পরিপূর্ণরূপেই কুরআন ও সুন্নাহ'র যথাযথ অনুসরণের উপর নির্ভরশীল আর এ কোন ধর্মীয় আবেগ কিংবা পুঁথিগত বিশ্বাসের বিচারে নয়; বরং অতীতকালে সংঘটিত ঘটনাবলীর বিজ্ঞানধর্মী নিরপেক্ষ পর্যালোচনা ও ঐতিহাসিক ফলাফলের আলোকে প্রমাণিত হয়েছে, ইসলাম-তথা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সীরাতই সকল কালের সকল দেশের সকল শ্রেণীর সকল মানুষের জন্যে একমাত্র পরিপূর্ণ মুক্তি বিজয় ও সফলতার পথ। এই সফলতা ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্র সকলের জন্যে ও সভ্যতা সংস্কৃতি

www.almodina.com

অর্থনীতি রাজনীতিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমভাবে প্রমাণিত। মূলত ব্যাপকতা, গভীরতা ও বাস্তবতার এই অন্তর্নিহিত শক্তির কারণেই মহান আদর্শের মূলপত্র পবিত্র কুরআনকে অলৌকিকভাবে সংরক্ষণ করেছেন মহান আল্লাহ যার বিস্ময়কর সংরক্ষণ সত্যের কাছে আধুনিককালের বীর বিজ্ঞানও চরম অসহায়।

আমরা সকলেই জানি, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময়ের এমন একটি ক্রান্তিকালে আগমন করেছিলেন এই মাটির পৃথিবীতে যে কালটাকে পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগণ 'আইয়্যামে জাহেলিয়্যাত' তথা অন্ধকার যুগ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু মাত্র তেইশ বছরের সংক্ষিপ্ত পরিসরে আল্লাহ নির্দেশিত পথ ও পদ্ধতিতে ইসলাম নামের এই শাশ্বত জীবন ব্যবস্থাকে তিনি এমনভাবে বিজয়ী করে তুললেন- সমকালীন পৃথিবীর সভ্যজনরা তখন ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণকে নিজেদের সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করেছেন আর দুর্ভাগ্যবশত যেসব কথিত পন্ডিত বুদ্ধিজীবী চিন্তাবিদরা ইসলামের সামনে আত্মসমর্পণ করতে পারেনি তারাও নিজেদের 'জাত' রক্ষা করার জন্যে ইসলামের এবং ইসলামের নবীর এই আদর্শিক সংগ্রাম ও বিজয়ের কোন উত্তম ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হয়েছেন।

ঐতিহাসিক এই বিস্ময়কর বাস্তবতা থেকে আমরা দু'টো বিষয় বুঝতে পারি।

১. ইসলাম- বিজয়ী হওয়ার জন্যেই যার আগমন!

২. আল্লাহ নির্দেশিত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পথে সাধিত ইসলামী বিপ্লবের সামনে শত্রু মিত্র সকলেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য- অন্তত মানসিকভাবে হলেও! খোলাফায়ে রাশেদার সোনাঝরা ইতিহাস যার জ্বলন্ত সাক্ষী। অবশ্য এও সত্য, এই আমরা মুসলমানরাই যখন আল্লাহ নির্দেশিত ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পথ ও আদর্শ ছেড়ে দিয়েছি তখনই শিকার হয়েছি ক্ষয় লয় ও পতনের। হারাতে শুরু করেছি একের পর এক মানচিত্র। আমাদের হাতের তৈরি মিনার চূড়ায় উড়তে শুরু করেছে বেঈমানদের পতাকা আর আমরা এখন এই পৃথিবীর পাতায় যেন এক 'হরফে গলত' ভুল চিত্র- যাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার লক্ষ্যে পৃথিবীর তাবৎ শক্তি ও গোষ্ঠি ঐক্যবদ্ধ

সেই ঐক্যবদ্ধ আঘাতে দিকে দিকে বইছে খুনের দরিয়া; ওঠছে নয়া কারবালার গগনবিদারী মাতম; ইথারে ভাসছে ইলাহী আহ্বান-ওয়ামা লাকুম... 'আর তোমাদের কি হলো, তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছো না দুর্বল সেই পুরুষ নারী ও শিশুদের পক্ষে যারা বলে : হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিস্কৃতি দাও, এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী।' [নিসা :

www.almodina.com

হক ও বাতিলের এই সংঘাত চিরন্তন! বাতিলকে চ্যালেঞ্জ করেই যুগে যুগে সত্য প্রতিষ্ঠার এই রক্তপিচ্ছিল ময়দানে আবির্ভূত হয়েছেন হযরাতে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম ও তাঁদের অনুসারী পরবর্তীকালের সকল হকপন্থী মুজাহিদগণ। অতঃপর প্রতিবাদ প্রতিরোধ আঘাত ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়েছেন তাঁরা অসীম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে। পদ ও সম্পদের লোভ, জীবন ও সম্মানের হুমকি কোন কিছুই তাঁদেরকে বিচ্যুত করতে পারেনি কাঙ্খিত টার্গেট থেকে, মুহূর্তের জন্যে ভুলে যাননি তাঁরা তাদের অভীষ্ট মনযিল।

আমরা যদি আমাদের প্রিয়তম হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাকাই তাহলে দেখবো, তাঁকেও শক্তিশালী ধুরন্ধর দর্পী বাতিলকে মোকাবেলা করে অগ্রসর হতে হয়েছে কাঙ্খিত মনযিলের দিকে। তাঁর কালের বাতিল শক্তিগুলোকে আমরা মৌলিকভাবে তিনভাগে বিভক্ত করতে পারি।

১. স্বজাতির অজ্ঞানতাপূর্ণ জাত্যাভিমান ও নেতৃত্ব হারাবার আশংকাপ্রসূত সরাসরি প্রতিরোধ, বাধা, হামলা ও ভাষাতীত নিপীড়ন- সমাজের দুর্বলরা ছিলেন যার বিশিষ্ট শিকার।

২. ঘরের ভেতর থেকে ইহুদী ও মুনাফেকদের অবিরাম ষড়যন্ত্রের ফাঁদ ও

৩. সমকালীন পরাশক্তিদ্বয়ের দর্পী হুংকার।

অতঃপর হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে পরাজিত করেছিলেন এই দুর্দন্ড প্রতাপতেজী ধুরন্ধর খিপ্তমতি দুশমনদেরকে, কী ছিল তাঁর পথ ও পদ্ধতি এ সুবাদে আলোচনা করার পূর্বে বরং আমাদের চলতিকালের বাতিলসমূহ, সমকালীন সমস্যাবলী, হক প্রতিষ্ঠার পথে বাধা ও অন্তরায়গুলো সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাত করে নেয়াটা এই কারণে জরুরী মনে করছি- যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক গৃহীত পথ ও পদ্ধতির আলোকে আমরাও সহজেই উত্তরণের একটা পথ পেতে পারি।

সমকালীন বাতিলসমূহ তথা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায়সমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গেলে, রূপ ও বৈশিষ্ট্যের কথা বাদ দিলে আমরাও নববীকালের মতোই মূলত মৌলিক তিনটি অন্তরায়ের শিকার।

১. পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার ধ্বজাধারী এই সমাজের কথিত আধুনিক শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মহল যারা মূলত ক্ষমতার মোহ, কালো টাকার লালসা, আধুনিক সভ্যতার নামে চালিত নফস রিপু ও প্রবৃত্তি চর্চার অন্ধ সংস্কৃতির ধান্ধাবাজি রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে আদা-জল খেয়ে ইসলামের বিরোধিতা করে। বর্ণ বংশে এরা আমাদের স্বজাতি হলেও এই দেশ জাতি ও ধর্মের এরাই সবচে'

www.almodina.com

বড় শত্রু।

২. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে ইহুদীরা ছিল একটি চিহ্নিত মহল! মুনাফেকরা বর্ণচোরা ভন্ডশ্রেণী হলেও তাদের নেতা, গতি আর আচরণ সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণা ছিল পরিষ্কার। নবীজীর যবান পাকে বর্ণিত আচরণ ও বৈশিষ্ট্যের পাথরে ঘষা দিয়ে মুহূর্তে চিহ্নিত করতে পারতেন তারা এই ভন্ডশ্রেণীটিকে। কারণ তাদের ঈমানী দূরদর্শিতা ছিল প্রখর। কিন্তু বর্তমানকালে ইহুদীদের চাইতে ভয়ংকর হলো ইহুদীদের পোষ্য পুত্রেরা যারা রঙ ও বর্ণে এদেশেরই মানুষ অথচ শিক্ষা চিন্তা ও বিশ্বাসে তারা ইহুদীদের জঘন্য ছায়ারূপ। অতঃপর এই এজেন্টদের হাতে বিক্রিত মুনাফেকদের রূপ শ্রেণী ও সংখ্যা গণনাতীত। এরা মুখে কাগজে বাংলাদেশী মুসলিম হলেও চিন্তা ও বিশ্বাসে দিল্লি মস্কো আমেরিকা আর ইজরাইলের বেদীন বেঈমানদেরই ভাবশিষ্য- স্বার্থে সামান্য আঘাত পড়লেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যত্রতত্র যখন তখন। আল্লাহর দীন কায়েমের পথে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় দেশের সরকার ও শিল্পের ওপর চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে কঠিন বাধার সৃষ্টি করে এই ধুরন্ধর মাথাবিক্রিত দালাল শ্রেণীটি।

৩. প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে পরাশক্তি ছিল নির্দিষ্ট একটি ভৌগলিক সীমানায় সীমিত। তাদের অবস্থান, শক্তি, গতি সবই ছিল চিহ্নিত। কিন্তু আজকের কালের পরাশক্তি দীন প্রতিষ্ঠার পথে বরং উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষার পথে অন্যতম প্রধান বাধা হলেও তার ধরন বড় মারাত্মক। তথ্য মিডিয়া ও উদ্ভাবনের বিষফল 'বিশ্বায়ন'-এর বদৌলতে সারাটা পৃথিবী এখন মুঠোর ভেতর। আধুনিককালের সবচে' জঘন্য আবদার এই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ফলে সারা পৃথিবী এখন অকথিতভাবে একই সভ্যতা একই সংস্কৃতি একই আদর্শ ও একই চিন্তাধারার শেখলে বাঁধা! বলা চলে, অর্থে অস্ত্রে বলবান বিশ্ব মাতাব্বরগণ বিশ্বব্যাপী একটা নাট্যমঞ্চ সাজিয়েছেন। তারা তাদের খুশিমত যখন যে রুচির যে সভ্যতার যে সংস্কৃতির চিত্র তুলে ধরবেন বিশ্বমঞ্চের তাবৎ শ্রোতা দর্শক তা দেখবে শোনবে অনুসরণ করবে। এই দেখা শোনা ও আন্দোলিত হওয়ার ভেতর দিয়ে সকলে ওঠে আসবে এক অভিন্ন সভ্যতার মঞ্চে। শুধু সভ্যতা সংস্কৃতিই নয়, উদারনীতির অর্থনীতির বদৌলতে বিশ্বের সকল শিল্প ওঠে আসবে একই বাজারে। ফলে শুরু হবে একই মাঠে সভ্যতা ও অর্থনীতির অসম ঘোড়া দৌড়। যারা বলবান তারা লাভবান হবেন আর যারা দরিদ্রসীমার বাসিন্দা তারা লাভ করবে দারিদ্রের স্থায়ী নাগরিকত্ব! শিল্পে অর্থে যখন পরাজিত হবে তখন সভ্যতা সংস্কৃতির গোলামী মেনে নিতে হবে নিজেদের

www.almodina.com

পেটের স্বার্থে, গুরুদের খুশি রাখার অবাঞ্ছিত লক্ষ্যে! বর্তমান বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর জন্যে এটাই সবচে বড় চ্যালেঞ্জ। সাম্রাজ্যবাদী এই দানবী উন্মত্ততাই সবচে' বড় বাধা।

৪. এই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া ও কথিত আধুনিক শিক্ষার আরেক সমন্বিত কুফল হলো মানসিক নাস্তিকতা- যেহনী ইরতিদাদ! মানুষ যখন পার্থিব অর্থ শক্তি ও ক্ষমতার কাছে বশ ও সমর্পিত হয়ে পড়ে, তখন সে বাহ্যত আস্তিক হলেও ভেতরে বিশ্বাসে অর্থ পদ ও শক্তিই তার কাছে প্রধান হয়ে ওঠে তখন সেও এই অর্থ পদ বিত্ত ও শক্তির 'মান' রক্ষা করতে গিয়ে ধর্মকে বিসর্জন দিতে দৃশ্যত কুণ্ঠিত হলেও এমন আহম্মকিও স্থূল ব্যাখা করে বসে যার কারণে আল্লাহ রাসূল ও ইসলাম শিকার হয় চরম অবমাননার। স্পষ্ট নাস্তিকতার চাইতে এই মানসিক নাস্তিকতা এই কারণে কঠিন সমস্যা হিসাবে বিবেচিত। এতে করে ইসলামের প্রকৃত দুশমন নাস্তিকরাই ইসলামের শিবির দখল করে থাকে বাহ্যিক ইসলামি মুখোশপরা পরিচয়ের দাবীতে। ফলে তাদের আচরণ সভ্যতা ও বক্তব্যের ভিত্তিতে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামের বিকৃত রূপ। আজ ইসলাম মানসিক নাস্তিকতার এই বিষ বিকৃতির শিকার পৃথিবীব্যাপী।

এক কথায় ঘরের শত্রু সঘোষিত নাস্তিক-মুরতাদ আর ইহুদী-খৃষ্টানদের মানসপুত্র দালাল মুনাফেকদের নানামুখি চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে যখন আমাদের অস্তিত্ব চরম বিপন্ন প্রায় তখন বিশ্বায়নের আঘাতে বিক্ষত আমাদের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড, বিলীনপ্রায় আমাদের নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতি ও স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধ অধিকন্ত সাম্রাজ্যবাদী ইঙ্গ-মার্কিন নানা পাঁয়তারা, চোখ রাঙানি আর অবাঞ্ছিত শাসানিয়া হুমকি ধমকিতে আমাদের দশা এখন ত্রাহি ত্রাহি! এই অবস্থা আমাদের একার নয়, বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর।

এই অবস্থাতে কোথায় ফিরে যাব আমরা? পার্থিব বিচারে আমাদের যারা বলবান বন্ধু সেই তেলের গেরস্ত আর সোনা দানার মালিকেরাতো বহু আগেই প্রমাণ করেছে আরশের অধিপতির চাইতে এই পৃথিবীর মোড়ল মুরুব্বীরাই তাদের কাছে অধিক পূজনীয়, বরণীয় প্রভু! সুতরাং প্রভুদের মর্জি ভঙ্গ করা তাদের তাকতের বাইরে। অতএব ফিরে যেতে হবে প্রিয়তম হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাঁর চিরন্তন আদর্শকে আগত অনাগত সকল মানুষের জন্য সমানভাবে বরণীয় পালনীয় বলে দাওয়াত দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন!

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করে এসেছি, আমরা এখন যেসব বাধা ও বাতিলের শিকার এসব বাধা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালেও ছিল। তবে

www.almodina.com

কালের সাথে তাতে যুক্ত হয়েছে কিছু আধুনিক মার-প্যাঁচের মাত্রা, আর বিজ্ঞান দিয়েছে তাতে মুহূর্তে উড়ে বেড়াবার মত তেলেশমাতি-বৈদ্যুতিক স্পিড! ফলে উদ্ভাবনের দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। অসংখ্য ধ্বংস ও অত্যাচারের গতিও হয়েছে দ্রুত থেকে দ্রুততর।

মাত্রাগত এই ব্যবধানটুকু বাদ দিলে মূল বিচারে আমরাও একই বাতিলের শেকলে বন্দী! সুতরাং আমাদেরকে খুঁজে দেখতে হবে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতিলের এই শেকল ভাঙ্গার জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সমকালীন সমুহ বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে কী প্রক্রিয়ায় তিনি সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর কী ছিল পথ আর কী ছিল পাথেয়!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে পবিত্র সীরাতের আলোকে একথা খুব সহজভাবেই বলতে পারি, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান ও অবিস্মরণীয় বিপ্লব ও তাঁর বিজয়ের দৃশ্যত প্রধান ভিত্তি ছিল এই- তিনি তাঁর মিশন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত ও বাস্তবায়নে যথার্থ যোগ্যতার অধিকারী সুশিক্ষিত প্রশিক্ষিত সুসংগঠিত এমন একটি জাতি গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন যাঁদেরকে এক কথায় 'কা-আন্নাহুম বুন্‌য়ানুম মারসুস' বলা যায়। কারণ মিশনের আদর্শে লালিত প্রশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত কর্মী বাহিনী ছাড়া কোন বিপ্লবকে সফল করার চিন্তা নিতান্তই স্বপ্নবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তো হযরত মূসা আলাইহি সালাম যখন তাঁর অপ্রশিক্ষিত তরবিয়তহীন জাতিকে আল্লাহর পথে সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন তখন তারা এই বলে নবীর আহ্বানকে উপেক্ষা করেছেন-

আপিন ও আপনার প্রভু গিয়ে লড়াই করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব।

অথচ একই ডাকের সাড়ায় হাজার বাহিনীর মোকাবেলায় মাত্র তিনশ' তের জন ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন বদর প্রান্তরে, প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিজয়ের রাজপথ

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, কী সেই তরবিয়ত বা প্রশিক্ষণ যার ছোঁয়ায় অন্ধকারে আলো জ্বলে আর ইতিহাসের আদর্শ বিবর্জিত দস্যিতায় পারঙ্গমতর একটি জাতি রূপান্তরিত হয়েছিল সোনার জাতিতে- যা ইতিহাসে মানব ও মানবতার অমূল্য অহংকার হিসাবে বিবেচিত আজো?

এই প্রশ্নের জবাবে আমরা সংক্ষেপে এইটুকু বলতে পারি, মহান আল্লাহ তাআলা প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিশন ও লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করেছেন এইভাবে-

'তিনিই তো প্রভু যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়ত ও সত্যদীনসহ প্রেরণ করেছেন

www.almodina.com

সকল দীনের উপর তাকে জয়ী করার জন্য।'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মসূচি তথা নববী পাঠশালার পাঠ্যসূচির কথা বিধৃত হয়েছে এইভাবে-

অতঃপর হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান এই মিশন ও কর্মসূচিকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও রুটিনকে অনুসরণ করছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত সকল আন্দোলন ও সংগ্রামের জন্যেই সমানভাবে অনুসরণীয়। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্মানিত সঙ্গীগণকে-

১. মুহাযযাব ও পরিশুদ্ধ ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন।

২. উত্তম চরিত্র ও জনসেবার উদার মহিমাময় গুণের পূর্ণাঙ্গ নমুনা হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন এই কাফেলার প্রতিটি সদস্যকে।

৩. যে কল্যাণ ও সফলতার বার্তা তাঁরা লাভ করেছিলেন সেই বার্তা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেয়ার দুর্বার প্রেরণায় করে তুলেছিলেন উজ্জীবিত।

৪. পরিবার সমাজ রাষ্ট্র সর্বত্রব্যাপী দীন মানার এক জামে ও পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসে ধনী করে তুলেছিলেন তাঁদের হৃদয় 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত' যার স্বাভাবিক ফসল।

৫. একমাত্র আল্লাহ ও রাসূলের ইচ্ছা অভিপ্রায় ও নির্দেশনাকেই তাঁদের সকলের জীবনের একমাত্র টার্গেট হিসাবে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছিলেন যার ফলে দীন রক্ষা প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় যে কোন ত্যাগ বিসর্জন ও আত্মদানের জন্য তাঁরা তাঁদের নিজেদের ভেতর থেকেই প্রবল দাবী ও তাগাদা অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। যে কারণে সহাস্যবদনে আল্লাহর পথে জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দেয়া ছিল পরম তৃপ্তি ও প্রাপ্তির বিষয়।

৬. মহান এই কাফেলার হৃদয় মন বিশ্বাস একমাত্র আল্লাহর বড়ত্ব শক্তি ও ক্ষমতার অপার বিশ্বাসে এতটা দৃপ্ত সমৃদ্ধ ও বলবান ছিল পার্থিব কোন বল শক্তি ও ক্ষমতাই যেখানে কানাকড়ি গুরুত্ব পেত না। ফলে তাঁদের সকল চিন্তা কর্ম ও সংগ্রামে বিবেচনায় থাকতো কেবলই আল্লাহর নযর রিযা ও সন্তুষ্টি

৭. চিন্তা কর্ম বিপ্লব ও সাধনায় তাঁরা সদাই ভাবতেন পরকালের কথা। পরকালভয়ের এই অদৃশ্য শক্তিই তাঁদের জীবন সাধনায় এমন এক বিস্ময়কর শৃংখলা গুরুত্ব ও প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল- যার ফলে তাঁরা যেদিকেই অগ্রসর হয়েছেন সফলতা তাঁদের পায়ে চুমু খেয়েছে। দেশের পর দেশ, জাতির পর জাতি আলোড়িত ও আলোকিত হয়েছে তাঁদের পায়ের ছোঁয়ায়।

আজ আমাদের সম্মুখে যে বাধার হিমাদ্রি-

www.almodina.com

১. স্বজাতীয় মুরতাদ গোষ্ঠী

২. ইঙ্গ-মার্কিনের ভাড়াটে দালাল, ইহুদী এজেন্ট আর বর্ণচোরা মুনাফেক শ্রেণী।

৩. মানসিক ইরতিদাদের শিকার সমাজের কথিত আধুনিক শিক্ষিত ভোগবাদী অসুস্থ শ্রেণী ও

৪. দাজ্জাল বিশ্বায়নের বিনাশী তুফান শিল্প ও মিডিয়া সন্ত্রাসকে মোকাবেলা করে দাঁড়াতে হলে প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ও কর্মসূচির আলোকে এমন একটি শিক্ষিত প্রশিক্ষিত দীপ্তমান সদাযুবক উদ্যোগী উদ্যমী কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে হবে-

১. যাঁরা ওহীর শাশ্বত জ্ঞানের যথার্থ উত্তরাধিকারী হবেন।

২. আধুনিককালের সমুহ সংকট সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেব হবেন।

৩. বিজ্ঞান কালের সমস্যাবলী জয় করার মত ওহীভিত্তিক সমাধান আবিষ্কারে পূর্ণ যোগ্য হবেন।

৪. কর্মসূচি বাস্তবায়নে যে কোন ত্যাগ ও কুরবানী দানে সর্বদা পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুত থাকবেন।

৫. কালের দাবী পূরণে যথার্থ কর্মপন্থা ও কৌশল আবিষ্কারে পূর্ণ সক্ষম ও

৬. আদর্শিক বল, বিপুল কর্মপ্রেরণা, অসামান্য দায়িত্বানুভূতি ও খোদার দরবারে স্বীয় কর্মসূচির সফলতায় পূর্ণ আস্থাশীল এক সদাজাগ্রত গোষ্ঠী।

ইসলামী ইতিহাসের নির্যাসিত শিক্ষা, উম্মাহ'র জীবনে প্রায় দেড় হাজার বছরের যাপিত বাস্তবতাকে সামনে রাখলে খুব সরলভাবেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, উল্লেখিত গুণ ও বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর সুশৃংখল প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনী ছাড়া কালের চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করা শুধুই কিছু পবিত্র খাব ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন প্রয়োজন খাবের আয়েশী পর্দা ছিঁড়ে বাস্তবতার কঠিন প্রাঙ্গণে পদার্পণ। অতঃপর টার্গেটকে জয় করার দুর্বার প্রেরণা নিয়ে টার্গেটের সুনির্দিষ্ট পথে জোর কদমে এগিয়ে যাওয়া।

www.almodina.com

নতুন শতাব্দীর সমস্যাবলী ও সীরাতুন্নবীর পয়গাম

এই পৃথিবীটা এখন শুধুই সমস্যার পৃথিবী। জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে গেছে সমস্যার জীবাণুগুলো। সমাজ রাজনীতি চরিত্র সংস্কৃতি সাহিত্য সভ্যতা সর্বত্রই সমস্যার ব্যাধি বেশ প্রকট। ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র সকল অস্তিত্বই এখন সমস্যার ভারে কুঁজো হয়ে পড়বার উপক্রম। অভ্যন্তরীণ আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রেই সমুহ সমস্যার দগদগে ঘা এখন। এটা সত্য, সমস্যার আঘাতকে মোকাবেলা করেই মানুষ টিকে আছে এই পৃথিবীতে সমস্যা মানব জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গের মত। তবে বর্তমানকালের সমস্যাবলী নিশ্চয়ই প্রাচীনকালের সমস্যাবলীর মত নয়। এককালে মানুষ ছিলো সাদাসিধে। তাদের জীবন ছিল সরল গদ্য কিংবা মেঘনা-পদ্মার পানির মত বহমান তাই সেকালের সমস্যাগুলোও ছিল সহজ সরল। পরবর্তীকালে মানুষের মেধা বুদ্ধির অবিরাম কর্ষণ ও সাধনার ফলে সভ্যতা সংস্কৃতিতে যেমন নতুন নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে তেমনি জীবন সাধনার পরতে পরতে গড়ে উঠেছে জটিল প্রকৃতির অগণিত সমস্যা। সমস্যার রঙ রূপ প্রকৃতিতে দুর্বোধ্যতা, জটিলতা ও মার-প্যাঁচের সৃষ্টি হয়েছে চলমান সভ্যতা-সংস্কৃতির রূপালী রূপান্তরের সাথে সাথে প্রাচীনকালের সমস্যার সাথে আধুনিক কালের সমস্যাবলীর এই যা পার্থক্য। অন্যথায় মূল সমস্যা প্রাগৈতিহাসিক কালেও ছিল, আজো আছে।

এটাও সত্য, সমস্যার পাহাড় দেখে কোন কালেই মানুষ থমকে দাঁড়ায়নি। জীবন ও সভ্যতার চাকা থেমে যায়নি। বরং মানবমন্ডলী সর্বদাই কালের সমস্যাবলীকে চিহ্নিত করেছে, সমস্যার ধরণ ও ধর্ম আবিষ্কার করেছে। অতঃপর তা অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়েছে। এ পথে উৎসর্গিত বিপ্লব ও সাধনার ইতিহাস সুবিদিত।

এই আলোকেই বলি, বর্তমান কালের সমস্যাবলীকে তো আর ফু দিয়ে উড়িয়ে দেয়া যাবে না এবং তা অস্বীকারও করার যুক্তি কিংবা কারণ নেই। বরং যা প্রয়োজন তা হলো কালের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে, তার স্বভাব প্রকৃতি ও প্রভাবগুলো নির্ধারিত করে তা থেকে উত্তরণের পথ আবিষ্কার করা।

যদি জিজ্ঞেস করা হয় আজকের যুগের সমস্যাগুলো কি কি? তাহলে একালের যে কোন সময় সচেতন ব্যক্তিই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর দীর্ঘ ফিরিস্তি

www.almodina.com

শোনাতে পারবে। আমি তার বিবরণ দিয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাই না। বরং যে কথা বলতে চাই তাহলো, ওসব সমস্যাবলীর সমাধান কোন পথে? সমস্যার এই অতল গহ্বর থেকে উত্তরণের কি কোন পথ আছে? থাকলে সেটা কি? অধিকন্তু সমস্যার এই ভয়ংকর অন্ধকার থেকে যদি উত্তরণের পথ থেকেই থাকে তাহলে সমস্যাগুলোর সমাধান হচ্ছে না কেন? সমস্যাবলী দূরীভূত হবার পরিবর্তে দিন দিন তা পূঞ্জীভূত হচ্ছে কেন? অথচ একথা মানতেই হবে, এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের নিরবধি প্রত্যাশা হলো শান্তি নিরাপত্তা ও সুখময় জীবন। যান্ত্রিক যানবাহনের মত বিশ্বময় এই যে শ্রম ও সাধনার অবিরাম সংগ্রাম এর অভিন্ন লক্ষ্য তো সেই সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি। অথচ পৃথিবী প্রতিনিয়ত প্রতি কদমেই যেন শান্তি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে; উত্তরণের পরিবর্তে মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে পতনের অতল গহীনে।

সমস্যা হলো মানব দেহের ব্যাধির মত। ছোট বড় যে কোন ব্যাধি দেখা দিতেই মানুষ চাই সে যে শ্রেণীরই হোক না কেন সঙ্গে সঙ্গে তা দূর করতে চেষ্টা করে। রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা নেয়ার পরও যদি রোগীর উন্নতি না হয়, চিকিৎসা সত্ত্বেও যদি রোগ ক্রমে বেড়েই চলে তখন সকলেই ধরে নেয় এর চিকিৎসার কোথাও গলদ আছে। চিকিৎসা ঠিকমত হচ্ছে না। তাই রোগীর কোন উন্নতি হচ্ছে না।

অতঃপর শুরু হয় ঔষধ পরিবর্তন থেকে চিকিৎসক পরিবর্তনের পালা। এতেও যদি সুফল পরিলক্ষিত না হয় তখন সকলে মিলে এমন কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক খোঁজে বের করতে অস্থির হয়ে পড়ে যিনি রোগ ব্যাধি ও মেডিসিন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। রোগের স্বভাব ধরন ও উৎপত্তি সম্পর্কে সম্যক অবগত অভিজ্ঞ প্রাজ্ঞ কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় এবং এও প্রতিষ্ঠিত সত্য, অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রথমেই রোগের মূল উৎস অনুসন্ধান করেন। রোগের উৎপত্তিস্থল আবিস্কার করতে সচেষ্ট হন। অতঃপর রোগীর স্বভাব, আবহাওয়া, মৌসুম ও ব্যাধির সার্বিক প্রকৃতি বিবেচনায় রেখে তার চিকিৎসায় ব্রত হন। যদি রোগ যথাযথভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে এবং স্বভাব প্রকৃতি ও অবস্থা মাফিক যদি ঔষধ পড়ে থাকে তাহলে খুব অল্প চিকিৎসাতেই অনেক জটিল রোগ কেটে যায়। পক্ষান্তরে গলদ চিকিৎসা অনেক সাধারণ ব্যাধিকেও জটিল কঠিন ব্যাধিতে রূপান্তরিত করে ছাড়ে।

সংক্ষিপ্ত এই ভূমিকার আলোকে যদি সমকালীন চলতি শতাব্দীর সমস্যাবলীকে বিচার করি তাহলে আমরা দেখব এ যেন

সেই-

'চিকিৎসা তোমার হয়েছে যত

www.almodina.com

ব্যাধি বেড়েছে তত।'

এরই প্রতিধ্বনি। সমস্যা সমাধানের যত চেষ্টা ও আয়োজন করা হচ্ছে সমস্যা ততোই বাড়ছে, জটিল রূপ ধারণ করছে। এতে একথাই প্রমাণিত হয়, আমাদের চিকিৎসার কোথাও গলদ আছে, সাধনা ও আয়োজনের অন্দরে নির্ঘাত খাদ আছে। হয়তো সমস্যা চিহ্নিত করতে ভুল হচ্ছে কিংবা ঔষধ সমাধানপত্রে ভুল হচ্ছে। যার ফলে চারদিকে গড়ে উঠছে সমস্যার পাহাড়। যে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত বর্তমান বিশ্ববাসী হাজার উঁকিঝুকি দিয়েও সমাধানের সূর্য দেখতে পাচ্ছে না।

এটা সহজ কথা, কাবার যাত্রীকে কাবার পথেই চলতে হবে। কাবার পথের মুসাফির যদি তুরানের পথে যাত্রা করে তাহলে শত সদিচ্ছা, আন্তরিকতা ও সাধনা সত্ত্বেও সে তার কাঙ্খিত মনযিলে পৌঁছাতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক। বরং যতই সে সম্মুখে অগ্রসর হবে ততোই মনযিল থেকে দূরে সরে পড়বে। কারণ, তার পথ ভুল। ভুলপথে চলে কখনো মনযিলে পৌঁছা যায় না, লক্ষ্য সাধিত হয় না।

আমাদের বর্তমান কালের অবস্থাও অনুরূপ। সমস্যাপীড়িত বিশ্বমানবগোষ্ঠী সমস্যার বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে চায়। তাদের চেষ্টারও সীমা নেই। কিন্তু প্রতিদিন তারা উত্তরণের পরিবর্তে বরং আরো নিত্য নতুন সমস্যায় জড়িয়ে পড়ছে। লক্ষ্য চিহ্নিত ও সুনির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও মানবজাতি তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্য স্পর্শ করতে পারছে না।

কথায় আছে, রেশমী সুতোয় যদি প্যাঁচ লাগে তাহলে তার মাথা যদি কোনক্রমে আবিষ্কার করা যায় তাহলে সেই প্যাঁচ পার করে সুতো উদ্ধার করা কোন কঠিন বিষয় নয়। কিন্তু সুতোর মাথা আবিষ্কার না করে যদি কেউ জোর খাটিয়ে মুখস্থ টানাটানি জুড়ে দেয় তাহলে সেই গ্রন্থি যে আর খোলা যাবে না একথা সকলেই জানে। বর্তমান সমস্যাক্রান্ত পৃথিবীর অবস্থাও তাই। সমস্যার মূল চিহ্নিত করে কায়দামত তা দূর করার চেষ্টা না করে বরং বল খাটিয়ে আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের দানবীয় আঘাতে জট খোলার চেষ্টা চলছে। ফলে সমস্যার রেশমী জাল ক্রমেই জটিল রূপ ধারণ করছে।

যদি প্রশ্ন করা হয়, কেন পারছে না মানুষ সমস্যার শেকড় আবিষ্কার করতে? কেন মূলটা চিহ্নিত করে সরল একটি টানে সমস্যার বৃক্ষটাই উপড়ে ফেলা যাচ্ছে না? এর জবাবও অতি সহজ! তাহলো, সমস্যায় যে শেকড়-বাকড় ছড়িয়ে এক ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ আকার ধারণ করেছে তা সম্যকরূপে বুঝা, উপলব্ধি করা ও নির্ণয় করা মানুষের সীমিত ক্ষুদ্র জ্ঞানের দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ যে মানুষ তার পেছনের অতীত সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারে না, তার বর্তমানের

www.almodina.com

বিচার করতে চরম সন্দিহান, যে মানুষ তার আগামী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ সে মানুষ কিভাবে চিহ্নিত করবে তার সমস্যার প্রকৃতি, ভবিষ্যত প্রভাব ও অনিবার্য ফলাফল! অধিকন্তু তার কালের চলমান সমস্যাবলীর এমন সুন্দর সমাধান সে কি করে আবিষ্কার করবে যা নিশ্চিতভাবে তার বর্তমানকে সমস্যামুক্ত করবে, ভবিষ্যতকে সমৃদ্ধ করবে তার আগামীকে করবে নির্ঝঞ্ঝাট। বরং এর জন্যে প্রয়োজন এমন এক সত্তার নির্দেশনা ও রাহনুমায়ী যাঁর কাছে অতীত যেমন নিশ্চিত পরিচ্ছন্ন ভবিষ্যতও তেমনি সন্দেহাতীতভাবে জ্ঞাত। অধিকন্তু যিনি মানব ও মানবতার অসীম কল্যাণকামী। কোনরূপ ভূমিকা ছাড়াই বলা যায় মহান এই গুণের একমাত্র অধিকারী মহান রাব্বুল আলামীন। আর তাই তিনি মানব জীবনের সমুহ সমস্যার নিশ্চিত সমাধানের পাথেয়সহ প্রেরণ করেছেন তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তিনি সমস্যার পুঞ্জীভূত আঁধার ভূমি বর্বর আরব ভূখন্ডে আগমন করলেন। দস্যু তশকর আদর্শহীন একটি যাযাবর জাতি যখন মেনে নিল তাঁর প্রেসক্রিপশন বদলে গেল অস্থির শৃংখলাহীন আরবরাজ্য। বর্বররা হলেন সোনার জাতি।

তিনি সমস্যাপীড়িত মানবগোষ্ঠীকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে জানালেন, তোমাদের এই জীবনব্যাপী যে সমস্যার মরণজাল এর মূল হলো তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার পয়গাম ও জীবনদর্শনকে ভুলে গেছো। অতঃপর স্থূলদৃষ্টিতে নিজেদের জন্যে যা ভাল মনে করছো তাই গ্রহণ করছো। আর তোমাদের দৃষ্টির দুর্বলতা ও বিচারের সীমাবদ্ধতার কারণে সাময়িক সুখ ও আনন্দের নেশায় যা পরম প্রার্থনীয় ভেবে গ্রহণ করেছো তাই তোমাদের ভবিষ্যত সমস্যা ও স্থায়ী পতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতঃপর তিনি আল্লাহ প্রদত্ত 'কুরআন' নামক প্রেসক্রিপশনটি মানব মন্ডলীর সামনে সচিত্র আকারে তুলে ধরেন নিজের জীবন চিত্রের আয়নায়। প্রতিটি আহত আক্রান্ত মানুষ তাঁর জীবন আরশীতে দেখতে পায় তাদের জীবনের সার্বিক মুক্তির ছবি। আর এ জন্যে তাঁর জীবনচিত্রকে পবিত্র কুরআনের বাস্তব নমুনা বলা হয়।

সমস্যার যাতাকলে পিষ্ট বঞ্চিত ভাগ্যাহত সেই আরব জাতি যখন সমস্যার সকল গ্রন্থি উম্মোচনের এই মহান পথ লাভ করলো তখন তারা শুধু কৃতজ্ঞ আর আমোদিতই হলো না বরং কিয়ামত পর্যন্ত সকল সমস্যাহত মানুষ যাতে জীবন পথের যে কোন সমস্যাকে জয় করতে পারে সেজন্যে মুক্তির এই মহাসনদ, সমস্যা সমাধানের এই দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনা পবিত্র কুরআনকে বর্ণ বিন্দুসহ অনুপম পদ্ধতিতে আত্মস্থ করে নিল। আমল ও আনুগত্যের মাধ্যমে যেভাবে কুরআনের প্রতিটি হরফকে তারা সমাজ জীবনে প্রতিফলিত করেছেন ঠিক একইভাবে কুরআনের প্রতিটি বর্ণ বিন্দু যতিচিহ্নকে পর্যন্ত মুখস্থ করে পৃথিবীর ইতিহাসে এক

www.almodina.com

অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পবিত্র কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষার আলোকে প্রতিষ্ঠিত সে কাল সমাজ ও রাষ্ট্র কতটা সুস্থ সবল শান্ত ও সমস্যামুক্ত ছিল অবিস্মরণীয় সে ইতিহাস সকলেরই জানা। পবিত্র কুরআনের সেই পরীক্ষিত নির্দেশনা আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই অবিসংবাদিত শিক্ষা ও রাহনুমায়ীর মূল বিষয় ছিল তিনটি।

১. তাওহীদ ২. রিসালাত ৩. ও আখিরাত

মৌলিক এই তিনটি বিষয়ের সারকথা হলো, প্রকৃত মালিক প্রভু ও নিয়ন্তাকে একমাত্র মনিব ও সুখ-দুঃখের আশ্রয় মনে করে তাঁর প্রতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সমর্থন ও বিশ্বাস স্থাপন করা। অতঃপর নবুওয়ত ও রিসালাতকে জীবনের সফলতা ও স্বার্থকতার একমাত্র অদ্বিতীয় পথ হিসাবে গ্রহণ করে পৃথিবীর অন্য সকল তন্ত্রমন্ত্র থেকে পরিপূর্ণভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং পরকালে বিচার দিবসে যে প্রতিটি কথা কর্ম ও চিন্তার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে সে বিষয়ে সতর্ক সজাগ বিশ্বাসই হলো জীবন সমস্যার সকল ক্ষেত্রে বিজয় ও উত্তরণের মৌলিক উপায় এবং একমাত্র পথ। আমরা যদি নিরপেক্ষ ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবমুক্ত হয়ে ভাবি তাহলে দেখব, আজকের যুগের এই নতুন কালের সকল সমস্যার মূল হলো বিষয় তিনটির প্রতি উম্মাহর সীমাহীন উদাসীনতা অবজ্ঞা ও গাফলত। তাই উম্মাহ যদি সমস্যার বেড়াজাল ছিন্ন করে বিজয়ের পিঠে উঠে দাঁড়াতে চায় তাহলে অবশ্যই এই তিনটি বিষয়কে অত্যন্ত মজবুতভাবে গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান পৃথিবীর সমস্যাগুলোকে যদি আমরা ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে অংকিত করতে চাই তাহলে এর অন্যতম একটি বিষয় দাঁড়াবে পরস্পর বিভক্তি, দূরত্ব, বিশৃংখলা ও দলাদলি। যদি অমুসলিমদের প্রসঙ্গটি বাদ দিয়েও আলোচনা করি তাহলে শুধু মুসলমানরাও যে এসব সমস্যায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত এ বিষয়ে আশা করি সচেতন কোন মুসলমান দ্বিমত করবেন না এবং এতেও কোন দ্বিমত করবেন না যে, আজ মুসলিম উম্মাহ যে করুণ পরিণতির শিকার এরও প্রধান কারণ এই পারস্পরিক দূরত্ব বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃংখলা। আর এই ব্যাধি নিরসনের একমাত্র কার্যকর পন্থা হলো তাওহীদ আল্লাহ কেন্দ্রিক ঐক্য, আপনত্ব ও আন্তরিকতা। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আল খালকু ইয়ালুল্লাহ' বলে যে ঐক্যের প্রতি আহ্বান করছেন অধিকন্তু ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সোনার কাঠি বুলিয়ে বরং বংশ ও দেশ জাতির মেকি ভেদাভেদের সমুহ অন্ধকারকে ঝেটিয়ে তাড়িয়েছেন। প্রতিষ্ঠিত করেছেন এক আল্লাহ কেন্দ্রিক জীবন সমাজ রাষ্ট্র ও উম্মাহ। দেশ জাতি বর্ণ দল ভিত্তিক খন্ডিত চিন্তা কর্ম ও সংগ্রামই আজকের পৃথিবীর অন্যতম বড় সমস্যা। এ থেকে উত্তরণের পথ সেই তাওহীদ কেন্দ্রিক নববী শিক্ষা ভিত্তিক ঈমানী

www.almodina.com

ভ্রাতৃত্বের রসে সিঞ্চিত 'উম্মাহ'পন্থী বিপ্লব।

উম্মাহর জীবনের আরেকটি বড় সমস্যা প্রান্তিকতা। প্রান্তিকতার রোগে অস্তিত্বের ঘোড়া এখন ত্রাহি ত্রাহি করছে। যেখানে পরিপূর্ণ ইসলামকে মানব জাতির মুক্তি ও বিজয়ের পথ হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে সেখানে দীনের নানা খন্ডিত বিশ্বাসে উম্মাহ আজ অস্থির! যে যে অংশ মানছে সে ওটাকেই পূর্ণাঙ্গ দীন মনে করে বসেছে। আর যেটা সে মানছে না সেটা কুরআন হাদীসের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও নানা বাহানায় বর্জন করে চলছে। বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির মহাব্যাধি থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীরাতে অনুসরণ।

রিসালাত এর মাধ্যমে মূলত আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বিষয় ও বস্তুর স্তর নির্ণিত ও চিহ্নিত করে দিয়েছেন। কোন কাজটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, কোনটি কতটা ঘৃণিত ও বর্জনীয়, কোন কাজটি কোন পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য কিংবা প্রত্যাখ্যানযোগ্য সবই বিধৃত হয়েছে রিসালাতের ভাষায় কুরআনে হাদীসে। সমাজ সভ্যতা নির্মাণের মানদন্ড এই রিসালাতের পয়গামকে যখনই কোন সম্প্রদায় উপেক্ষা করেছে তারা তখনই অবিরাম সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। অতঃপর সমস্যার আঘাতে আঘাতে একদা হারিয়ে গেছে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে।

আজকের পৃথিবীর সর্বাধিক আলোচিত বিষয় হলো অর্থনীতি। অর্থনীতিই তথা অর্থই বর্তমান বিশ্বের মূল চালিকা কেন্দ্র। অর্থে যারা প্রধান তারাই এখন দেবতা। অতঃপর অর্থের মোড়ল এই শ্রেণী যখন সময়ের শিক্ষা সভ্যতা রাজনীতি সবই নিয়ন্ত্রণ করে নিজেদের ইচ্ছামত বয়ে চলে তখন স্বৈরতন্ত্রের দুর্দন্ড দাপট। সে দাপটে যারা দুর্বল তারা আরো দুর্বল হয়, অসহায়রা হয় আরো অসহায়। আর বিত্তবানরা হয় অর্থের কুমির, বাহ্যিক আকারে মানুষ হলেও প্রকৃতি ও স্বভাবে বন্যপশু। আমরা এই সাধারণ নাগরিকরা আজ সেই মানবরূপী বন্য হায়েনাদের জঘন্য লোভের শিকার।

পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসহায়দের প্রতি আন্তরিক ভ্রাতৃত্বপূর্ণ দয়া, অনুদান, উপহার, সুদমুক্ত ঋণদান, অনিবার্য সাদকা যাকাত ও সর্বোপরি 'আফ' ভিত্তিক কল্যাণকামিতার যে প্রত্যয়পূর্ণ অর্থবন্টন পদ্ধতি ও অর্থনৈতিক কাঠামো এই মানব জাতিকে উপহার দিয়েছেন তাতে শুধু সকল শ্রেণীর মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার নিরাপত্তা-ই প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং ধনী-গরীব আর উঁচু-নীচুর মধ্যে একটা হৃদ্যতাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার অঙ্গীকারও নিহিত রয়েছে।

কারূনী চরিত্রের নির্লজ্জ আয়োজন সঞ্চয় চিন্তার লোলুপ দর্শন একদিকে যেমন পুঁজিবাদের জন্ম দিয়েছে অন্য দিকে জন্ম দিয়েছে সমাজতান্ত্রিক কমিউনিজমের।

www.almodina.com

গড়ে উঠেছে শ্রেণী দ্বন্দ্ব। বিকল হয়ে পড়েছে অর্থনীতির চাকা সারা পৃথিবীর অর্থনীতি এখন এই দুই নরকের শেকলে বাঁধা। অতঃপর সমাজের অঘোষিত পুঁজিবাদীদের ঋণখেলাপীর বোঝা বেঈমান শাসকরা চাপিয়ে দিচ্ছে ভ্যাটের নামে সাধারণ নাগরিকদের উপর। বাড়ছে দ্রব্যমূল্য হু হু করে। অসহায় খেটে খাওয়া এবং মধ্যবিত্তরা হতাশায় ভেঙ্গে পড়ছে। ভেঙ্গে পড়ছে ক্ষুদ্র শিল্পের মালিকেরা। এই চিত্র সারা বিশ্বের। তার উপর চলছে বিশ্বায়নের নামে ধনী দেশগুলোর উচ্ছিষ্ট চাপিয়ে দিয়ে দরিদ্র দেশগুলোকে আরো অসহায় করে তোলার পৈশাচিক আয়োজন। সন্দেহ নেই, অর্থনৈতিক যাঁতাকলে পিষ্ট বিশ্ব মানব জাতিকে এই জুলুম থেকে মুক্ত হতে হলে ফিরে আসতে হবে হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেই। এর একমাত্র এবং সর্বশেষ ও চূড়ান্ত যুক্তি হলো, এই পৃথিবী, মানুষ ও সম্পদের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনিই জানেন এই পৃথিবীর সম্পদগুলো কিভাবে বন্টিত হলে এখানকার প্রতিটি প্রাণী জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা পাবে। আর তিনি যেহেতু সকলেরই সৃষ্টিকর্তা সুতরাং সকলের প্রতি তাঁর দরদ ও আন্তরিকতা হবে পক্ষপাতমুক্ত। তাই তাঁর বন্টন ব্যবস্থাও হবে পরিপূর্ণ সুষম ও ইনসাফভিত্তিক। বস্তুত রিসালাতের মাধ্যমে মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ প্রদত্ত সেই সুষম সুন্দর অর্থনীতিই মানব জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন। এটাই আজকের অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে উত্তরণের বিকল্পহীন একমাত্র পথ।

বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম একটি সমস্যা হলো সন্ত্রাস। সন্ত্রাসের উৎস অস্ত্র। অস্ত্র একটি শক্তি। এটি কল্যাণকরও হতে পারে আবার অকল্যাণকরও হতে পারে। যদি কল্যাণকামী সভ্যজনদের হাতে শক্তি থাকে তাহলে সেটা কল্যাণের পথে ব্যয়িত হবে। আর দুষ্টজনের হাতে থাকলে তা ব্যয় হবে দুষ্ট ও অনিষ্টের পথে। এর একটি অতি সহজ উপমা হলো, এক ঝাঁক দুষ্ট কিশোরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে শিক্ষকের হাতের একটি বেতই যথেষ্ট। আবার শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে যখন এই বেত কোন দুষ্ট শিষ্যের হাতে পড়ে তখন এই বেতটিই আবার সমুহ বিশৃংখলা ও অনিষ্ট সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট। আর এ কারণেই অস্ত্র যদি সভ্য নীতিবান ও আদর্শবান ব্যক্তির হাতে থাকে তাহলে এই অস্ত্রই হতে পারে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার বড় সহায়ক।

অবশ্য এমন সুখকর দৃশ্য এখন পৃথিবীর সর্বত্রই অনুপস্থিত। সমাজের নীতিহীন চরিত্রহারা বখাটেদের হাতে অস্ত্র থাকার কারণে যেভাবে সমাজ ও দেশ সন্ত্রাসের হাতে যিম্মি একইভাবে আন্তর্জাতিক বদমাশ অসভ্য ও চরিত্রহীনদের হাতে পারমাণবিকের নিয়ন্ত্রণ থাকায় সারা পৃথিবী এখন অস্থির। পৃথিবীর প্রতিটি মানচিত্রই ত্রাসিত।

www.almodina.com

আমরা জানি, বদর যুদ্ধের বন্দীদের বিষয়ে যখন পরামর্শ ডাকেন প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হযরত আবু বকর (রা.) এই যুক্তিতে বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেয়ার প্রস্তাব দেন যে, এতে করে মুক্তিপণ হিসাবে যে অর্থ আসবে তাতে আমরা অস্ত্র ক্রয় করতে পারব। অবশ্য তারা ভবিষ্যতে মুসলমানও হতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যুক্তিকে সমর্থন করেছিলেন। কারণ, তৎকালীন অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য সভ্যজনদের হাতে শাসনের বেতটি (সামরিক অস্ত্র) থাকা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। পৃথিবী জানে, অতঃপর মুসলমানগণ যখন সামরিক শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তখন পৃথিবীতে যে শান্তি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সৃষ্টি হয়েছে ইতিহাসের পাতায় সে এক বিস্ময়কর অধ্যায়।

কিন্তু এসব কিছুর চাইতে বড় সমস্যা বরং যাকে সমস্যার জননী বলা যায় সে হলো, মানুষের পরকাল বিমুখতা। বান্দা হিসাবে, মাখলুক হিসাবে একদা যে প্রতিটি মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে প্রতিটি কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে এই অনুভূতির অভাবই মানুষকে বেপরোয়া হিংস্র ও লোভী করে তোলে। যার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে প্রতিটি মানুষই এক একটি সমস্যার ক্ষুদ্র খামার কিংবা উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হয়। একথা সীরাত পাঠক মাত্রই জানেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদার যুগে তো আজকের মত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও দমনের এত আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা ছিল না। তারপরও তো অপরাধ সংঘটিত হবার হার বর্তমানের কিংবা ইসলামপূর্ব কালের তুলনায় ছিল শূন্যের কোঠায়। এর একমাত্র কারণ হলো, ফিকরে আখিরাত তথা পরকাল চিন্তা বিচার দিবসে মহান সৃষ্টিকর্তার সামনে দাঁড়িয়ে জবাবদিহিতার ভয়।

সাব কথা হলো, পৃথিবীব্যাপী আজ যে সমস্যার অপ্রতিরোধ্য সয়লাব এর মূল কারণ ও উৎস হলো আসমানী নির্দেশনার উপেক্ষা। সৃষ্টিকর্তার সাথে গাদ্দারীর ফসল। সুতরাং এ থেকে উত্তরণের একমাত্র চূড়ান্ত শাশ্বত ও পরীক্ষিত পথ হলো হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত জীবন-দর্শন। আর এই জীবন-দর্শনের মূলমর্ম হলো- তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত! অতএব কোন তন্ত্রে মন্ত্রে নয় আধুনিক কালের সকল ঝঞ্ঝাট, সংকট ও সমস্যাকে জয় করতে হলে সীরাতুন্নবীর ডাকে সাড়া দিতে হবে। কারণ, সীরাতুন্নবীই হলো কিয়ামতাবধি আগত অনাগত সকল মানুষের, সকল দেশের জয় মুক্তি ও সফলতার চিরন্তন অঙ্গীকার।

www.almodina.com

নাগরিক নিরাপত্তা : সীরাতুন্নবীর পয়গাম ও সমকালীন জীবন ব্যবস্থার ব্যর্থতা

এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা মানব জাতিকে এই পৃথিবীতে বসবাস করার জন্যে একটি নির্ধারিত ছক এঁকে দিয়েছেন। যদি পৃথিবীর মানবগোষ্ঠী সৃষ্টিকর্তার এই ছক অনুসরণ করে, ছকের ভেতর থেকে জীবন যাপন করে তাহলে সমগ্র দুনিয়াব্যাপী একটি মানুষের অধিকারও যেভাবে আহত হবে না ঠিক সেভাবে একটি মানুষও অস্বাভাবিক মৃত্যুর মুখোমুখি হবে না। যদি কোনরূপ ভূমিকা ছাড়া বলতে হয় তাহলে সংক্ষেপে বলতে পারি, সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নির্বাচিত সেই অমোঘ জীবন ছকটি-ই হলো সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবনধারা। সংক্ষিপ্ত অথচ এত সারগর্ভ এই মহান জীবনধারা যে, পৃথিবীর সকল কালের সকল শ্রেণীর সকল মানুষের অনুসরণ করার মত যথার্থ পরিপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে মাত্র তেষট্টি বছরকাল ব্যাপী এই দীপ্ত সীরাতে।

শিশু থেকে বুড়ো, শ্রমিক থেকে বণিক, প্রজা থেকে রাজা এবং ব্যক্তি সমাজ রাষ্ট্র বিশ্ব সকল অবস্থা ও সংকটের দীপ্ত সমাধান রয়েছে তাঁর এই মহান সীরাতে। তারচে ও বিস্ময়কর বিষয় হলো, গতকালের ঘটনা যেখানে আজ এসে বিকৃত হয়ে পড়ে আদ্যোপান্ত বিজ্ঞানের শত অস্ত্র দিয়ে গুঁতোগুঁতি করেও আর মূল রহস্যকে উদ্ধার করা যায় না। সেখানে অবৈজ্ঞানিক ও উপায় উপকরণের এক আকাল কালে আবির্ভূত এক মহান মানবের জীবনচিত্রকে এত সূক্ষ্ম কঠিন ও প্রত্যয়পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে যে, মানব জাতির ইতিহাসে যা সম্পূর্ণরূপে অভূতপূর্ব এক বিস্ময়কর সত্য। এর একমাত্র প্রধান মৌলিক কারণ এটাই, যেহেতু কেয়ামত পর্যন্ত মানব জীবনের সার্বিক বিজয় সফলতা ও উত্তরণের একমাত্র বিশ্বগাইড এই মহান সীরাত তাই মহান প্রভু কুদরতীভাবেই এর সংরক্ষণ করেছেন, সংরক্ষণের যাবতীয় উপায় উপকরণ তৈরি করে দিয়েছেন।

এই নাগরিক নিরাপত্তার কথাই বলি! আজ আমাদের দেশের সবচে' বড় আতংক হলো অস্বাভাবিক মৃত্যু। কোন মানুষই এখন অস্বাভাবিক মৃত্যুআতংক মুক্ত নয়। সমাজের উঁচু নিচু সকলেই সমান। এমনকি ফুলের মত পবিত্র

www.almodina.com

আমাদের বুকের ধন শিশুরাও এই আশংকা সীমার বাইরে নয়। বরং বিত্তবানদেরকে কাবু করার ও মুঠোয় আনবার অস্ত্র হিসাবে নিয়মিত কিডনাপ হচ্ছে এই নিষ্পাপ শিশুরা। অতঃপর খুন হচ্ছে নির্মমভাবে। সাদা কালো কোন দল কোন সরকারই এদেশের নাগরিকদের স্বাভাবিক মৃত্যুর আশ্বাস দিতে পারছে না। এদেশ কেন পৃথিবীর কথিত কোন উন্নত দেশও না।

অথচ আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে হযরত মুহাম্মদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর ভাষায় দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে গেছেন- 'আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যাতিরেকে তাকে হত্যা করো না: [বনী ইসরাইল : ৩৩]

শুধু এখানেই শেষ নয়। বরং কোন একজন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করাকে সমগ্র মানব হত্যার সমার্থক বলে ঘোষণা করেছেন: ইরশাদ হয়েছে-

'নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করা ব্যতিত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল। [মাইদাঃ ৩২]

অন্যের জীবন কেন কেউ চাইলে নিজের জীবনকেও বিনাশ করতে পারে না। এই অধিকার কোন মানুষের নেই। বরং মানব সমাজে মানুষের ইতি হবে স্বাভাবিক মৃত্যুর মাধ্যমে। তাই আত্মহত্যাকে পর্যন্ত জঘন্য অপরাধ বিবেচনা করা হয়েছে কুরআনের ভাষায়। ইরশাদ হয়েছে-

'লা-তাকতুলু আনফুসাকুম'

'তোমরা আত্মহত্যা করো না।'

অতঃপর মানব জীবনের এই মহান মর্যাদা শুধু একটি শুভ উচ্চারণ হিসাবেই ধ্বনিত হয়নি; নাগরিক জীবনের এই কাংখিত মূল্য শুধু পুঁথিপত্রেই শোভিত হয়ে থাকেনি বরং হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঐশী বাণীকে মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করে মানবতার সর্বোচ্চ মর্যাদা ও নাগরিক জীবনের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং মানব জীবনের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের একটি চূড়ান্ত নির্ভুল ও বাস্তব উপমা স্থাপন করে গেছেন।

যারা সৃষ্টিকর্তার স্পষ্ট এই বিধান সত্ত্বেও নরহত্যার মত জঘন্যতা প্রদর্শনের পৈশাচিক দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করবে তাদের শাস্তির কথা ওহীর ভাষায় এইভাবে উচ্চারিত হয়েছে-

'নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্যে কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে।' [বাকারা : ১৭৮]

অর্থাৎ- নিহত চাই নারী হোক বা নর, মুসলমান হোক বা অসুমলমান, ধনী হোক বা গরীব- হত্যাকারীর শাস্তি হলো কিসাস- মৃত্যুদন্ড। অন্য আয়াতে আরও

www.almodina.com

পরিষ্কার করে বলা হয়েছে-

'মানুষ হত্যার বিচারে মানুষকেই হত্যা করা হবে।' [মাইদা : ৪৫]

কিন্তু কেন এই মানব হত্যা? অন্য আয়াতে তার সুগভীর তাৎপর্যও বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- 'ওয়াফিল কিসাসি হায়াতুন'- মৃত্যুদন্ডের মধ্যে নিহিত রয়েছে জীবন। মর্ম খুবই সরল। ঘাতকের মৃত্যুই সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তার উপায়। শরীরে 'ঘা' জিইয়ে রেখে যেভাবে শরীরের অবশিষ্ট অঙ্গগুলোকে সুস্থ ও নিঃশংক রাখার কথা ভাবাই অবান্তর। অতএব, সহজ বিধান হলো 'ঘা'টাকে শরীর থেকে আলাদা করে দাও। অনুরূপভাবে যে 'মানুষ' (?) মানুষ খুন করতে পারে সে 'ঘাতক' মানুষ নয়। সে পশুও নয়। যদিও পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট। বরং সে মানুষ সমাজে একটি বিষাক্ত ঘা। সমাজের অন্য সকল সভ্য ও সুশীলজনদের নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক মৃত্যুকে নিশ্চিত করতে হলে এই 'ঘা' কেটে ফেলতে হবে।

মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই 'ঘা' অপারেশনের যৌক্তিক ও অপরিহার্য পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতেই পূর্ণ আরব্য দীপপুঞ্জ জুড়ে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন- যা আজো ইতিহাসের বাতিঘর হয়ে ফুটে আছে মানবতায় বিস্তীর্ণ ভুবনে। অতঃপর খোলাফায়ে রাশেদা যে সোনাঝরা ইতিহাসের জন্ম দিয়েছিলেন সেও ঠিক একই ছকের অনুসরণের ফসল। এবং এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিস্ময়কর সফলতা লাভ করেছিলেন তার অন্যতম কারণ হলো, তাঁর টার্গেট ছিল নাগরিক নিরাপত্তা, মানব জীবনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও সুশীল সমাজ নির্মাণ। তাই তিনি এক্ষেত্রে আশরাফ আতরাফ-এর বিভাজন সৃষ্টি করেননি। জাত পাত তো দূরের কথা মুসলমান অসুমলমানেরও পার্থক্য করেননি। বরং তিনি বিচার করেছেন 'মানুষ'। মানুষ হিসাবে সকল মানুষ এক আদমের সন্তান। আদম সন্তানেরা জীবন ও সম্ভ্রমে সকলেই সমান। ভাই ভাই! মক্কা বিজয়ের পর তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশ্য প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন-

'সকল প্রশংসা সেই মহান সত্তার যিনি তোমাদেরকে মূর্খকালের অহংকার থেকে মুক্ত করেছেন। মানুষ দুই প্রকার। সৎ আল্লাহ ভীরু। এরা আল্লাহর দরবারে খুবই সম্মানিত। দ্বিতীয় পাপী হতভাগা। আল্লাহর দরবারে এদের কোন মুল্য নেই। শোন সকল মানুষ এক আদমের সন্তান। আর আদমকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।'

কী চমৎকার জীবন-দর্শন। মাটির তৈরি আদমের পুত্র কুল বনী আদম। তবে কেন এত উঁচু নিচুর তফাৎ? কেন ছোট বড় বলে এই মিথ্যে অহমিকার চেঁচামেচি? আশরাফ আতরাফের অবাঞ্ছিত বিশ্বাস এলো কোত্থেকে? কে শেখালো জাত পাতের ব্যবধান? দল মতের এত ফারাক বিভাজন কোন খন্নাসের দান? নিশ্চয়ই

www.almodina.com

ইসলামের নয়

ইসলামের নবী- মানুষের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এসেছিলেন এই মিথ্যে বিভাজনের সকল প্রাচীর ভেঙ্গে বিশ্বময় এক আল্লার সুবিনীত দাসমন্ডলীর একচ্ছত্র এক ঈমানী রাজ প্রতিষ্ঠিত করতে। তাই যখন তাঁর কাছে মামলা এলো, এক মুসলমান আরেক অমুসলমানকে হত্যা করে ফেলেছে! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন, ঘাতকের গর্দান উড়িয়ে দাও। আরও ইরশাদ করলেন, যদি কোন অমুসলিম আমাদের সাথে কৃত [রাষ্ট্রীয়] অঙ্গীকার রক্ষা করে তাহলে আমরাও তার সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করব।

অতঃপর খোলাফায়ে রাশেদাও চলেন ঠিক একই পথে। হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলেও এক অমুসলমানকে হত্যা করে বসে আরেক মুসলমান। উমর (রা.) স্পষ্ট ঘোষণা দেন, যদি মৃতের অভিভাবকরা রক্তপানে রাজী না হয় তাহলে এই ঘাতকের গর্দান উড়িয়ে দেব আমি। হযরত আলী (রা.)-এর শাসনামলেও পুনরাবৃত্তি হয় অনুরূপ বিচারের। [দেখুন, পয়গাম্বরে ইনসানিয়্যাত : খালিদ সাইফুল্লাহ রাহমানী]

মূলত অপরাধী ঘাতকের প্রতি এই রুদ্র কঠিন শাসনের ছড়িই এই পৃথিবীকে উপহার দিয়েছিল এমন এক মানুষের রাজ্য- যেখানে সকল শ্রেণীর সকল ধর্মের সকল মানুষই ছিল সম্মানিত নিরাপদ নাগরিক।

অথচ আজ যখন আমরা এই একবিংশ শতাব্দীর ঊষালগ্নে সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখরে বসে মাতাল নৃত্যে লেজুর নাড়াই আর দেড় হাজার বছর পূর্বেকার ইতিহাসের 'হিরকখন্ড'কে উটের যুগ আর মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলে গালি দিই তারাই কুরবানীর পশুর মত শত শত টুকরা হয়ে ছড়িয়ে পড়ি বন-বাদারে, দুটো পয়সার জন্যে বদ্ধ পুকুরে পচে গলে শেষ হয় আমাদেরই বুকের ধন সন্তানরা। তবুও বলি, আমরা উন্নত হয়েছি।

বলি না, নাগরিক নিরাপত্তা বিধান ও স্বাভাবিক মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্যে কোন আইন নেই! আছে। সেই আইন এত দীর্ঘ ও পুষ্ট, যদি সেই আইনের সকল ভাষার সকল গ্রন্থ একত্রিত করে এই হতভাগা বাঙালী জাতির পিঠে রেখে দেয়া হয় তাহলে এই আইনের চাপেই এই দুর্বল জাতি মরে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট। যেভাবে মরছে এই আইনের ফাঁদে পড়ে সমাজের প্রভাব ও বিত্তহীন অসহায় ফরিয়াদীরা! কিন্তু যা নেই তাহলো, গ্রন্থবদ্ধ সেই আইনের কোনরূপ প্রভাবমুক্ত, আইনসিদ্ধ প্রয়োগ! ফলে আইন পাড়া হচ্ছে এখন শুভংকরের মঞ্চ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি নিজেকে আল্লাহর প্রতিনিধি মনে করতেন- এরচে' বেশি কিছু নয়। আর মানুষ যেহেতু আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষের জীবন সম্ভ্রম সব কিছুরই মালিক আল্লাহ। তাই আল্লাহর

www.almodina.com

মালিকানায় হাত দেয়ার মত দুঃসাহসিকতা দেখায় যে হাত, সে ঘাতক। আল্লাহর নির্দেশ, তাকে জনসমক্ষে হত্যা করে ফেল। যাতে- ১. তার কৃত অপরাধের শাস্তির বিধান হয় এবং ২. সমাজে লুকিয়ে থাকা অন্য অপরাধীরাও শিক্ষা লাভ করে এবং নিজের জীবনের মায়ায় অন্যের জীবনের প্রতি হাত বাড়াবার ভয়ংকর পাশবিকতা থেকে ফিরে আসতে পারে।

বিচিত্র সভ্যতার এই আধুনিককালে এক অদ্ভুৎ মানবতাবাদ প্রসব করেছে বেঈমান পশ্চিমারা। তারা শিখিয়েছে, জনসমক্ষে কারো গর্দান উড়িয়ে দেয়া জঘন্যতা এবং মানবতাবিরোধী। বড় কোমলচিত্ত কণ্ঠ! অতএব, ঘাতককে লালন কর কারাগারের আড়াল প্রকোষ্ঠে দুধ-কলা খাইয়ে। দুধকলার পয়সাতো রেখেই গেছে। তারপর যদি ফাঁসির রশি ছেঁড়ার মত ধন প্রভাব ক্ষমতা না থাকে গোপনে ঝুলিয়ে মার, যাতে একজন ঘাতক মরলেও আর দশটা ঘাতকের মনোবল না ভাঙ্গে। ঘাতক পোষার বড়ই নিপুণ কৌশল এই মানবতাবাদ।

অতঃপর সেই ধরা পড়ার বাইরে সংরক্ষিত সেই পোষা ঘাতকের অবিরাম তান্ডবে খুনে খুনে রক্তাক্ত এখন পৃথবীর পুরো মানচিত্র। বাধনহারা সর্বহারা নামে মাঝে মধ্যেই নাড়া দিয়ে ওঠছে ঘাতকের দল। কখনো বা অঘোষিত আক্রমণে প্রাণ হারাচ্ছে সমাজের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক কিংবা বিত্তবান ব্যবসায়ী। ছুটছে বেতনের সুতোয় বাঁধা আদর্শহীন সরকারী বাহিনী ঘাতকের সন্ধানে। শত ঘাতকের মধ্য থেকে একটি যদি মিস ইনফরমেশনের ফলে ধরা পড়েও তারপর শুরু হয় উপরের চেয়ারের তদবীর আর গণতান্ত্রিক দলীয় চাপাচাপি। ফুরুৎ করে বেরিয়ে পড়ে সোনার ছেলেরা! তাজা হয়ে উঠে নাগরিক আতংক! পরদিন মাটির উপর উঁচু হয়ে পড়ে থাকে মামলাবাদী কোন সম্ভ্রান্ত মজলুম আদম সন্তান। এই হলো কথিত সুশীল গণতন্ত্র কিংবা কথিত আইনের শাসন। যেখানে মানুষ মনে করে না, মানুষের জীবন সম্ভ্রমের মালিক আল্লাহ। যদি কেউ আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষা করে কোন মানুষের জান-মালের উপর আঘাত করে তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে অপরাধীর উপর- যেমনটি করেছিলেন মানুষের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এখানে কোন দল ব্যক্তি ধর্ম বা ক্ষমতা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। অধিকন্তু তার প্রয়োগ হবে আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত পন্থায়- শাস্তি ও শাসনের শাশ্বত রূপে- যে রূপে প্রয়োগ করেছিলেন মানব জীবনের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার সর্বশ্রেষ্ঠ সফলতার অধিকারী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দল জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণীর সকল নাগরিক আজ সেই শাসনই চায়।

www.almodina.com

বাইআতুর রিদ্ওয়ান : প্রতিশোধের অগ্নিশপথ

হিজরী ষষ্ঠ সালের কথা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খাব দেখলেন। বড়ই ঈমানদীপ্ত সে খাব। তিনি দেখলেন, তিনি ও তাঁর সম্মানিত সাহাবীগণ মক্কায় প্রবেশ করছেন। খাবটি তাঁর ভেতরে এক পবিত্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। স্মৃতির বিস্তৃত ভুবন জুড়ে প্রিয় মাতৃভূমি মক্কার বিয়োগ যন্ত্রণাগুলো অব্যক্ত হাহাকার তুলে। সেই সাথে অনেকটা আনন্দও অনুভব করেন তিনি। হোক না খাব। মাতৃভূমির সাক্ষাৎ তো ঘটেছে। তার উপর কাবার যিয়ারত! তাছাড়া নবীর খাবতো আর অবান্তর হতে পারে না। তাই ভোরের বাতাসের মত মৃদু সুখ, মৃদু প্রত্যাশার কম্পিত অনুভূতির মধ্য দিয়ে শয্যা ত্যাগ করলেন প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তখন ছিল ফজর নামাজের সময়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোজা চলে এলেন মসজিদে। নামায আদায় করলেন। নামায আদায় শেষে প্রতিদিনকার মত সাহাবীদের দিকে মুখ করে বসলেন এবং রাতের দেখা স্বপ্নটির কথাও আলোচনা করলেন। সেই সাথে এও বলেছিলেন, 'আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা খুব শীঘ্রই নির্বিবাদে কাবায় প্রবেশ করবে।'

মক্কা ছিল মুহাজিরগণেরও প্রিয় মাতৃভূমি। মক্কার প্রতিটি বালু কণার সাথে ছিল তাদের নাড়ীর সম্পর্ক। একদা এই জন্মভূমি থেকেই তাদেরকে নির্দয় নির্মমভাবে বহিষ্কার করে দেয়া হয়েছিল। বাড়ি ঘর থেকেও তারা আজ নির্বাসিত। হৃদয়ের পুঞ্জীভূত কষ্টগুলো নবীজীর স্বপ্নের কথা শোনতেই যেন কাঁচা দগদগে হয়ে উঠল। তারা আজ পরদেশী। অথচ তাদের অনেকের সন্তানরাও এখনো পর্যন্ত মক্কায়। বংশের আপনজন আবাল্য বন্ধুরাও মক্কায়। তাই মক্কাকে তারা কোনক্রমেই ভুলতে পারেন না। মক্কার কথা মনে হতেই দুচোখ ভরে উঠে উষ্ণ অশ্রুতে। তাই নবীজীর কণ্ঠে এই সুসংবাদ শোনতেই সকলের মধ্যেই এক আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। সাজ সাজ রব পড়ে গেল সর্বত্র। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথারীতি উমরা পালনের ঘোষণাও দিয়েছিলেন। আনসার মুহাজির সকলের মধ্যেই পবিত্র বাইতুল্লাহ যিয়ারতের এক উষ্ণ কোমল উত্তেজনা। তবে অসীম আবেগ ও আনন্দের উত্তেজনা ততোধিক শ্রদ্ধা ও আজমতের ভারে নমিত এবং শৃংখলাবদ্ধ। চৌদ্দশত সহযাত্রীর সশস্ত্র কাফেলা এগিয়ে চলে পবিত্র উমরা পালনের অকৃত্রিম মানসে।

www.almodina.com

চলতে চলতে কাফেলা যখন উসফান নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছায় তখন বুশর বিন সুফয়ান খোযায়ী এসে সংবাদ দেয়, কুরাইশরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে এবং তারা একটি অশ্বারোহী বাহিনী 'কুরাআতুল গামীম' নামক স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছে। একথা শোনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ সভা ডাকলেন। নাজুকতর এই মুহূর্তে কী করা যায় জানতে চাইলেন সাহাবায়ে কেরামের কাছে। হযরত আবু বকর [রা.] বললেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি উমরা পালন ও বাইতুল্লাহ তাওয়াফের উদ্দেশ্যে আপনার যাত্রা অব্যাহত রাখুন। যদি কেউ আমাদের এ পথে বাধা দেয় আমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পরামর্শে সায় দিয়ে কাফেলা এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেন এবং হুদায়বিয়ার দিকে দুর্গম পথে অগ্রসর হতে থাকেন। অবশেষে হুদায়বিয়ার উপকণ্ঠে এতে উপনীত হন। হুদায়বিয়ার পৌঁছার পর প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূত মারফত কুরাইশদেরকে তাঁর আগমনের পবিত্র লক্ষ্যের কথা জানিয়ে দেন। কুরাইশরাও যে হযরতকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না সেকথাও জানিয়ে দেয় দূত পাঠিয়ে। এভাবে কয়েক দফা দূত চালাচালির পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চূড়ান্ত ফয়সালা করতে চান এবং এ উদ্দেশ্যে হযরত উমর [রা.]কে মক্কায় দূত হিসাবে প্রেরণ করবেন বলে প্রস্তাব পেশ করেন। তখন হযরত উমর [রা.] এই বলে ওযর পেশ করেন যে, কুরাইশদের সাথে তাঁর শত্রুতা চরম পর্যায়ের আর তার স্বগোত্রের লোকেরাও তার উপর চরম ক্ষ্যাপা। নাগালে পেলে তারাও প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরের এই যুক্তিপূর্ণ অপারগতার প্রেক্ষিতে হযরত উসমান [রা.]কে দূত করে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। সিদ্ধান্ত মাফিক হযরত উসমান [রা.] আবান ইবন সাঈদ ইবন আস-এর আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন।

হযরত উসমান [রা.] ছিলেন মক্কার অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এক সন্তান। মক্কায় প্রবেশের পর কুরাইশ নেতাগণ হযরত উসমান [রা.]কে বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করার অনুমতি দেয়। কিন্তু বীর সন্তান হযরত উসমান [রা.] অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে ব্যতীত তাওয়াফ করব না। একথা শোনে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ স্তব্ধ হয়ে যায় এবং হযরত উসমান [রা.] কে ফিরে আসতে বাধা দেয়। হযরত উসমান [রা.] তাঁর দাবীতে অবিচল থাকেন।

এদিকে হযরত উসমান [রা.] ফিরে আসতে দেরী হওয়ায় নানারূপ সংশয় সৃষ্টি হতে থাকে। অবশেষে মুসলমানদের মাঝে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে, হযরত উসমান [রা.]কে শহীদ করে ফেলা হয়েছে। হযরত উসমান [রা.]-এর শাহাদাতের সংবাদ মুসলমানদের শিরায় শিরায় আগুন ধরিয়ে দেয়। চরম ক্রোধ ক্ষোভ যন্ত্রণা ও বিক্রমের কণ্ঠে হযরত রাসূলুল্লাহ [সা.] ইরশাদ করেন-

'উসমানের জানের বদলা না নেয়া পর্যন্ত আমি এখান থেকে সরব না।'

www.almodina.com

জ্বলে উঠে প্রতিশোধের অগ্নিশিখা। সে অগ্নিশিখা বিশ্বাসের তাপে এত কঠিন যা হাজার পৃথিবীকে পুড়িয়ে তামা করে দিতে পারে। অতঃপর যে বাবুল বৃক্ষের ছায়া তলে উপবিষ্ট ছিলেন প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানেই শুরু হলো প্রতিশোধের শপথ গ্রহণ। সেই শপথের ভাষা এত কঠিন শানিত ও রক্তসজীব যা আজো পৃথিবীর যে কোন মুমিনের ঈমান বিশ্বাস ও চেতনার বরফ সাগরে আগুন সৃষ্টি করতে পারে মুহূর্তে। তাঁরা সেদিন বৃক্ষতলে এই মর্মে শপথ নিলেন-

'আমাদের শরীরে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে ততক্ষণ আমরা বেঈমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাব। জীবন দেব কিন্তু পলায়ন করব না।'

শপথের ডাক পড়তেই সাহাবী আবু সিনান আসাদী হাত বাড়িয়ে দেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার হাত প্রসারিত করুন। শপথ নেব।

কিসের শপথ নেবে, আবু সিনান! নবীজীর প্রশ্ন!

অন্তরে যে কথা ভাবছি

কী ভাবছো অন্তরে

ইয়া রাসূলাল্লাহ! ভাবছি, 'আল্লাহর পথে তলোয়ার চালাতে থাকব, হয়তো আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করবেন না হয় এ পথে জীবন বিলিয়ে দেব।'

হাত বাড়িয়ে দেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। শপথ গ্রহণ করেন হযরত আবু সিনান আসাদী [রা.]সহ অন্য সকল জানবায সাহাবীগণও। শুধু কি তাই! সাহাবী হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া [রা.] শপথ গ্রহণ করেন তিনবার। সাহাবীগণের শপথ গ্রহণের পালা শেষ হলে রাসূল [সা.] স্বীয় বাম হাত ডান হাতের উপর স্থাপন করে বলেন, এটা উসমানের পক্ষ থেকে শপথ!

শাহাদাতের অমিত উত্তেজনায় বিক্ষুব্ধ মুজাহিদীন ফেটে পড়ার উপক্রম। চোখের তারায় তাদের খেলা করছে খোদার রাহে জীবন দেবার অসীম উন্মাদনা! হৃদয়ের তাজা বিশ্বাসটা মূর্তিমান হয়ে বেরিয়ে এসেছে হাতে বুকে বাহুতে চোখের পাতায়।

আল্লাহর রাহে যারা এভাবে জীবন বিলায় চরম নির্দয়ভাবে তাদের প্রতি আল্লাহর রিযা ও সন্তুষ্টির দ্বার থাকে সদা মুক্ত। বৃক্ষতলে শপথগ্রহণকারীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ সে ঘোষণাই দিয়েছেন পবিত্র কালামে-

'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ গ্রহণ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন, যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দান করলেন এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' [সূরা ফাত্হ : ১৮-১৯]

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিশোধের অগ্নিশপথ ঘোষণা করলেন সাহাবায়ে কেরাম [রা.]-এর ঈমানী জোশ ও জযবা যখন

www.almodina.com

তরঙ্গায়িত হয়ে উঠলো, প্রতিশোধের দৃপ্ত অঙ্গীকারে যখন টগবগিয়ে উঠল ঈমানী খুন, দোলে ওঠলো চারপাশ। সংবাদ বাতাসের সাথে উড়ে গেল মক্কায়। যুদ্ধে যুদ্ধে ক্লান্ত, আঘাতে আঘাতে অবসন্ন মক্কাবাসী হযরত উসমান [রা.]-এর পথ ছেড়ে দিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সন্ধি করে জীবন রক্ষা করার চিন্তায়। এই ইতিহাস আমরা সকলেই জানি। কিন্তু আজ যে পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে আমাদের বসবাস, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যে পশু শক্তির নীচে আমাদের জীবন যাপন তাতে আজ নতুন করে বাইআতুর রিদওয়ানের দৃপ্ত শপথের পাঠ অনিবার্য হয়ে পড়েছে- জানি না কেবল সে কথা।

এতে কোন সন্দেহ নেই, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সরাসরি আল্লাহর নবী। আল্লাহর রহমতের সর্বাধিক উপযুক্ত সত্তা। তাওয়াক্কুল ও ভরসার দীপ্তমূর্তি ছিল তাঁর পবিত্র চরিত্রের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। অথচ আমরা বাইআতুর রিদওয়ান-এর ঘটনায় দেখি মহান এই শান্তিদূত যখন শোনতে পান হযরত উসমান [রা.]-এর শাহাদাতের সংবাদ তখন সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। সিজদায় নয়- দীপ্তকণ্ঠে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রতিবাদ নয়, প্রতিশোধের অবিনাশী অভ্রভেদী অঙ্গীকারে, কাঁপিয়ে তুলেন মরু প্রান্তর। কিন্তু আজ আমাদের মাঝে কৈ সে অঙ্গীকার? কোথায় সে প্রতিশোধের শপথ? তাহলে কি পৃথিবীটা স্বর্গ হয়ে গেছে? মুসলমানরা কি নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার অম্লমধুর জগতের বাসিন্দা আজ? তাহলে ফলিস্তিনীদের ওই রক্তাক্ত প্রতিদিন এর জবাব কি হবে? দুর্ভিক্ষের যাতাকলে পিষ্ট আফগানীরা কি তবে আমাদের ভাই নয়? নয়া কারবালার লক্ষ লক্ষ আলী আসগররা কি তবে আমাদের কেউ নয়? কাশ্মীর মায়ানমার আর গুজরাতের কান্না কি আমরা তাহলে শোনব না?

আর কতকাল আরা প্রতিবাদের রাজনীতি করব? ওরা জান নেবে আমরা শ্লোগান দেবঃ মানি না, মানব না-এ কেমন বিচার আমাদের? ওরা মানচিত্র দখল করে উম্মাহর হৃদয় চিরে কলজে বের করে খাবে আর আমরা পোস্টার নিয়ে মিছিল করব : ছেড়ে দাও, ছাড়তে হবে- এ কেমন হঠকারিতা আমাদের? এই কি আমাদের নবীর আদর্শ? তাহলে উসমান শাহাদত বরণ করেছেন শোনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন শ্লোগান দেননি! ঘোষণা দিয়েছেন প্রতিশোধের। সাহাবায়ে কেরাম কেন মিছিলের আয়োজন না করে শপথ নিয়েছেন আমরণ জিহাদের? বলতে চাই, আজ বড় প্রয়োজন আমাদের জীবন ও কর্মধারাটাকে নবীজীর আদর্শের সাথে মিলিয়ে দেখার। আর কতকাল রাজনীতির ভেলকিবাজি করে আত্মহননের পথে অগ্রসর হবো আমরা? আর কতকাল শানিত শ্লোগানের আঘাতে দাবিয়ে রাখবো প্রতিশোধের অনিবার্য বাস্তবতাকে? বিশ্বাস করি নির্যাতন ও নিপীড়নের যে হাবিয়া দোযখে পড়ে ত্রাহি ত্রাহি করছে উম্মাহ সেখান থেকে উঠে আসার জন্য আজ বিশ্বময় একটি বাইআতুর রিদওয়ান অনিবার্য হয়ে পড়েছে। সুতরাং 'রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী।'

৬
।

www.almodina.com

বদরযুদ্ধ : ঘুরে দাঁড়াবার জীবন্ত উপমা

আমাদের অনন্ত প্রেরণার উৎস 'বদর'। অসীম সাহসে অদৃশ্য বলে ঘুরে দাঁড়াবার জ্বলন্ত স্মারক বদরযুদ্ধ। খোদায়ী শক্তির বিস্ময়কর বিকাশ, ঈমানী পক্ষের অলৌকিক বিজয়ের চিরজীবন্ত উপমা বদরযুদ্ধ। একদিকে দৃশ্যত দুর্বল, সংখ্যায় স্বল্প আর যুদ্ধবিদ্যায় অপরিপক্ক এক ক্ষুদ্র বাহিনী অন্যদিকে যুদ্ধাস্ত্রে বলীয়ান, সৌর্য-বীর্যে খ্যাতিমান, পরিপক্ক কুশলী সৈন্যবাহিনীর বিশাল বহর। অসম শক্তির এই আকস্মিক সংঘাতে এত সহজে জয় হবে ঈমানদারদের একথা কল্পনাও করতে পারেনি মক্কার বলবান মাতব্বররা।

যুগ যুগান্তের সব মাতব্বরের মধ্যে অভিন্ন একটা চরিত্র বাস করে। চরিত্রটি হলো, তারা মনে করে মাতাব্বরীটা তাদের একক অধিকার। এ অধিকার নিয়েই তাদের জগতে পদার্পণ। সুতরাং এ অধিকার চর্চার জন্য তারা যখন যাকে যেভাবে খুশি ওঠ্ বস্ করাবে। সর্বিশেষ এই অনুশীলনের অবাধ ক্ষেত্র হবে সমাজের দুর্বল শ্রেণী। অনর্থক অহংকার আর মিথ্যা দম্ভের দেয়াল তাদেরকে এমনভাবে ঘিরে রাখে, তারা যেমন সত্য ও সুন্দরকে দেখতে পায় না, তেমনি হৃদয়াবদ্ধ হওয়ার কারণে অসহায় দুর্বল, নির্যাতিতরাও একদা ঘুরে দাঁড়াতে পারে, পারে প্রতিষ্ঠিত সবলের দম্ভ ও অহংকারের কাঁচের সৌধ ভেঙ্গে খান খান করে দিতে- একথা তারা কল্পনাও করে না। তাছাড়া পাপের অন্ধকারে আচ্ছন্ন মস্তিষ্কে সরল সুন্দর স্বচ্ছ বাস্তবতা অংকিত হবেই বা কিভাবে? বরং কালের বিন-াশী মোড়ল নমরূদ যেমন অবিরাম জুতোপেটার ভেতর দিয়ে উপলব্ধি করেছিল দম্ভিত পরাশক্তির কলংকজনক পতন; ইতিহাসের জঘন্য-জৌলুস ফেরাউনকে তার নিন্দিত পরাজয় উপলব্ধি করতে ডুবে যেতে হয়েছিল নীল নদের অতল তলে, তেমনি আবু জেহেলদেরও জীবনরসে সঞ্চিত করে পরাজয় পতন উপলব্ধি করার জন্য ছুটে আসতে হয়েছিল সত্য-মিথ্যার ফারাক প্রাঙ্গণ ঐতিহাসিক বদর প্রান্তরে। জানিনা কেবল একালের ফেরাউনদের বদর প্রাঙ্গনটা কোথায়?

একথা আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের কোন ঘটনা, জয় ক্ষয়, অভাব প্রাচুর্য কোন

www.almodina.com

কিছুই আকস্মিক কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে ঘটেনি। বরং দৃশ্যত ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ঘটনাটিও উম্মাহর জন্যে একটি আদর্শ, একটি সমাধান, একটি উজ্জ্বল নির্দেশনা। ঐতিহাসিক বদরযুদ্ধ ও তার বিস্ময়কর জয়কেও সেই একই দর্শনের আলোকে বিচার করতে হবে।

আজ যদি বৈষয়িক সাদৃশ্যতার নিরিখে আমাদের বর্তমানকে সাড়ে চৌদ্দশ' বছর পূর্বের অতীতের সাথে মিলিয়ে দেখি, এবং মিলিয়ে দেখার জন্যেই পাক কুরআন ঘোষণা করেছে- 'নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্যে উত্তম আদর্শ' -তাহলে আমরা দেখব আমাদের অসহায়ত্ব, অর্থ অস্ত্রের দুর্বলতা, বিশ্বমাতব্বরদের বিত্ত বৈভব, অস্ত্র-অর্থ, পেশিবল আর যুদ্ধবিদ্যায় আমরা ও বেঈমানরা যেন সেই জাহেলি যুগের অসমশক্তির একটি প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে আছি হাজার বছর পর। তারপর আমরা যদি আমাদেরকে সেকালের ঈমানী কাফেলার সাথে মিলিয়ে দেখি আগামী দিনের সম্ভাব্য কিংবা কাঙ্খিত কোন চিত্র কল্পনা করার জন্য তখন কিন্তু সাগর সাগর হতাশা ছাড়া আমরা আর কিছুই পাব না।

মুসলমানদের কিংবা ইসলামী ইতিহাসের ঘুরে দাঁড়াবার এই বাঁকে এসে যখন ভাবি এবং এর মূলমর্ম উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হই তখন প্রথমেই লক্ষ্য করি, মক্কার বেঈমানরা তো যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে আসেনি এ যাত্রায়। বরং আল্লাহর রাসূলই আঘাত করার জন্য বেরিয়েছিলেন মদীনা থেকে। এ এক ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং আক্রান্ত হবার জন্যে, জান দেবার জন্যে, রক্ত দেবার জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করা, অতঃপর আক্রান্ত রক্তাক্ত কিংবা শহীদ হবার পর 'আর যদি একজনও আক্রান্ত ... ' বলে প্রতিবাদ করার যে নিরীহ রেওয়াজ আমরা তৈরি করেছি, এ কিন্তু সত্যিই নববী সীরাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বরং লজ্জাজনক কাপুরুষতা মাত্র।

এও লক্ষণীয়, বদরযুদ্ধের সূচনাটা কিন্তু হয়েছিল আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়ী কাফেলাকে টার্গেট করে। ব্যবসায়ী কাফেলা কেন? যুদ্ধবিদ্যায় প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসীম দূরদর্শিতার পরিচয় ছিল এই সিদ্ধান্ত। কারণ, আল্লাহর রাসূল জানতেন, অর্থই তাদের সকল অনর্থের মূল। তিনি জানতেন, তাদের দম্ভ আস্ফালন ও নাচানাচির ভিত্তি হলো অর্থ। অর্থই জুলুম, নির্যাতন ও মোড়লিপনার মেরুদন্ড। মোড়লদেরকে শায়েস্তা করতে হলে প্রথমে ওদের মেরুদন্ডে আঘাত করতে হবে। বদর যুদ্ধের সূচনাতে এটাই ছিল হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের টার্গেট। অথচ আজ আমরা তাঁর

www.almodina.com

গর্বিত উম্মত হয়েও আমরা আমাদের কালের মোড়লদের মেরুদন্ড মজবুত করতে থাকি সদা সচেষ্ট। মোড়লরা আমাদের বাড়ি ঘর দখল করে নেয়। আমাদের অসহায় শিশু-নারীদেরকে পর্যন্ত নির্বিচারে হত্যা করে। আমাদের কিবলায় আঘাত হানার হুমকি দেয়। আমাদের হৃদয়ের বাদশাহ হযরত মুহাম্মদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে বিকৃত কার্টুন আঁকে। তবুও আমরা পারি না ইউরোপ আমেরিকার পণ্য বর্জন করতে। আমরা পারি না কোক আর ডেনিসের স্বাদ ছাড়তে। যে ইহুদীদের পাঞ্জাতলে বন্দী আমাদের পহেলা কেবলা আমরা পারি না সেই ইহুদীদের বর্জন করতে। আর আমাদের মধ্যপ্রাচ্যের স্বজন তেলের গেরস্তরা তেলের বয়কট করবে কি। তারা তো পারে না তেল বস্তায় ভরে নিয়ে মনিব মোড়লদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে। অথচ বদরযুদ্ধ আমারদেরকে ডাক দিয়ে যায় দুশমনদের স্বার্থে আঘাত হানতে। মানবতার শত্রুদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিতে। তাদেরকে অর্থনৈতিক চাপে ফেলতে। তাছাড়া বেঈমানদের প্রতি ঘৃণাজাত কঠোরতাইতো ঈমানের লক্ষণ।

এখানে এও প্রনীধানযোগ্য, অন্যকে আঘাত হানতে হলে আগে নিজের ভিতটা মজবুত করে নিতে হয়। আর যারা ঈমানদার, আল্লাহবিশ্বাসী তাদের ভিত হলো ঈমান। সকল শক্তি জয় ও প্রতিষ্ঠার একমাত্র মালিক মহান আল্লাহই এ ঘোষণা দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন, 'ওয়া-আনতুমুল আ'লাওনা ইনকুনতুম মুমিনীন, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি ঈমানদার হতে পার। দারে আরকামে শুরু হয়েছিল সেই ঈমানের যাত্রা। প্রতিনিয়ত তালিম হয়েছে সেই ঈমানের। ঈমানটা যখন হৃদয়ে অংকুরিত হয়েছে তখনই শুরু হয়েছে চারদিকে অগ্নিময় প্রতিরোধ। বাধার আগুনে পোড়ে সে ঈমান এতটা পরিপক্ব ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠেছে যে, শুধুই ঈমানের খাতিরে সম্পদ সন্তান স্বজন দেশ সবকিছু বিসর্জন দিয়ে পাক মদীনায় হিজরত করতে যেমন কুণ্ঠিত হননি মুহাজিরগণ, তেমনি একই ঈমানের তাড়নায় সমগ্র পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ করে এই মুহাজির সম্প্রদায়, সমকালীন পৃথিবীর স্পষ্ট প্রতিপক্ষ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমাদর করে আশ্রয় দিয়েছেন সম্মানিত আনসারগণ। আল্লাহ তাআলার বিঘোষিত অঙ্গীকার অনুযায়ী তাঁরা বিজয়ী হয়েছেন ঈমানের বলে! অর্থ অস্ত্র কিংবা জনশক্তির বলে নয়!

বদরযুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াবার আরেকটি মৌলিক ভিত্তি খুঁজে পাই 'ইবাদত'। ইসলামী ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন, বদর রণাঙ্গনে সাহাবায়ে কেরামের ক্ষুদ্র বাহিনীকে সারিবদ্ধ দাঁড় করিয়ে দিয়ে আল্লাহর রাসূল প্রভু দয়াময়ের

www.almodina.com

সকাশে এই বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন : 'হে আল্লাহ! তুমি যদি এই ক্ষুদ্র দলটিকে ধ্বংস করে দাও তাহলে এই মাটির পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার মত আর কেউ থাকবে না। প্রিয় নবীজির অবিস্মরণীয় এই দুআই বলে দিচ্ছে সংগ্রামের টার্গেট কি ছিল। আর আমরা এখন কী দেখি? দেখি, ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী নায়করা গদির ছোঁয়া পেতেই ভুলে যান বিপ্লবের সবক। পেছনে পড়ে থাকে আহত বিক্ষত রক্তাক্ত কর্মীবাহিনী। নেতা মগ্ন হয়ে পড়েন আধুনিক গাড়ি, বহুতল ভবন আর অর্থের পুটুলি সংগ্রহের কোমল ব্যস্ততায়। বলুন, এদের মুখে বদরের সংগ্রামের ইতিহাস কি মানায়?

সারকথা হলো, ঈমানী বল, বিশ্বাসিক শক্তি, প্রশিক্ষিত দুর্বার সুসহংত কর্মীবাহিনীর অতি নগণ্য উসিলা লয়ে দৃশ্যত বলবান অসম শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার, স্ব-উদ্যোগে আঘাত হানার এক সাহসী উচ্চারণ বদর। শত্রুপক্ষের বরং সকল কালের সকল ফেরাউনের মূলপুঁজি অর্থনৈতিক মেরুদন্ডে সশক্তি পদাঘাত হানাই বদরের চেতনা। রিপু ও নফসের সাধ পূরণের লক্ষ্যে নয়, খোদার বন্দেগী, ইলাহী শাসন আর সত্যের আওয়াজকে উঁচু করে ধরাই হবে যার চূড়ান্ত টার্গেট। তিনশ' তেরজন জানবায সাহাবী সে টার্গেট পূরণে শতভাগ সফলতায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রমাণ করেছিলেন, বিশ্বজাহানের মহান অধিপতির দীনকে সকল ধর্ম মত দর্শনের উপর বিজয়ী করার সংগ্রামে একতায় অবতীর্ণ হও, সংখ্যায় যদি তোমরা কম হও, তাহলে আকাশ থেকে ফিরিশতা নেমে আসবেন ঝাঁকে ঝাঁকে। তবুও বিজয় হবে তোমাদেরই, তোমাদের দীনেরই। আজ দেড়শ কোটি উম্মতী কি পারবে সেই ঝুঁকিটুকু নিতে মাত্র তিনশ' তেরজন একদা নির্দ্বিধায় মাথায় তুলে নিয়েছিলেন যে ঝুঁকির পাহাড়? এজন্য শুরুতেই হয়তো টেকসই বাটার সুবিধা, কোকের কোমল স্বাদ আর ডেনিসের তলপেটে আঘাত হানতে হবে, পদাঘাত! এ পথে অস্ত্র অর্থ জনশক্তি নয় ঈমানই একমাত্র শক্তি! বাঁচতে হলে ঘুরে দাঁড়াতেই হবে। ঘুরে দাঁড়াবার প্রেরণার মশাল হাতে দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে বদর যুদ্ধের ঈমানদীপ্ত দাস্তান। উম্মাহ সাড়া দেবে কি?

www.almodina.com

সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের [সা.] সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ্ পতনের কারণ ও উত্তরণের পয়গাম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী একথা আর যুক্তি প্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন নেই। কারণ সভ্য পৃথিবীর অমুসলিমরা পর্যন্ত যখন তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হিসাবে বরণ করতে পেরে গর্বিত, কৃতার্থ তখন উম্মতী হয়ে আমরা আর অত শত প্রমাণ খুঁজতে যাব কেন? তাছাড়া স্বয়ং আল্লাহ তাআলা যাঁকে 'সারা জাহানের রহমত' বলে আখ্যায়িত করেছেন; যাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য 'শুভ সংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী' বলেছেন- যাঁর জীবন সৌন্দর্যকে বিশ্বের তাবৎ মানুষের জন্যে 'উত্তম আদর্শ' হিসাবে উল্লেখ করেছেন; যাঁকে এই বলে মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত করেছেন' 'আমি তোমার স্মরণকে সুউচ্চ করেছি' যাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এই ভাষায় 'আমিতো তোমাকে দিয়েছি কাউসার' চারিত্রিক উৎকর্ষ, অনুপম সৌন্দর্য, অমলিন বংশবিভা আর গগনস্পর্শী সফলতাপূর্ণ তার ব্যক্তি সত্তারই নয় কেবল বরং তাঁর আবাসভূমির মর্যাদাও এত উচ্চতর স্বয়ং প্রভু যার নামে শপথ করেছেন এইভাবে 'আমি এই শহরের কসম করে বলছি- যে শহরে আপনি থাকেন!'

বিশ্ববিধাতা প্রভু যাঁর বিমল উজ্জ্বল জীবন সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব কী আর বর্ণনার অপেক্ষা রাখে? যাঁর নূরময় অস্তিত্বের ছোঁয়ায় মৃত সভ্যতা জীবন লাভ করেছে; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুঞ্জীভূত জাহেলিয়াতের সকল অমানিশা বিদূরিত হয়েছে; পথহারা মানবতা পেয়েছে পথের সন্ধান; আদম নূহ ইবরাহীম ইসমাইল মূসা ঈসা [আলাইহিমুস সালাম]-এর রোপিত নিহত আদর্শের সকল বৃক্ষ জেগে উঠেছে নব যৌবনে; সৃষ্টির সকল আত্মায় সৃষ্টি হয়েছে 'প্রাণ'- সেই মহান সত্তার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার ভাষাই বা কার আছে? অতএব, শত অপারগতা সহস্র অক্ষমতার ভেতরও এই ভেবে গর্বিত হই, যাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার সাধ্য নেই। ক্ষমতা নেই যাঁর অপরূপ সৌন্দর্য বর্ণনার, যার মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও সফলতাকে অংকিত করার ন্যূনতম সামর্থ নেই- তিনিই আমাদের রাসূল, তিনিই আমাদের পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

দুই.

মূলত এটাই আমাদের আত্মপরিচয়ের প্রধান সূত্র। এই যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ

www.almodina.com

রাসূলের উম্মত এই হিসাবেই তো আমরা শ্রেষ্ঠ উম্মাহ। মহান এই নবীর সুবাদেই তো আমরা বাবা আদম [আ.] থেকে নবী ঈসা [আ.] পর্যন্ত সকল নবীর সকল উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। তাই বলি, প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন প্রাস্থানের বরকতে ধন্য কালের রাজা 'রবিউল আউয়াল- প্রথম বসন্ত' শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরোজ্জ্বল স্মৃতিগুলোকেই সজীব করে তুলে না, বরং শ্রেষ্ঠ নবীর বন্ধনে আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের আসনটির কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায় প্রতি বছর অতি নীরবে।

নীরবে বললাম এই কারণে, প্রতি বছর 'রবিউল আউয়াল' মাসের আগমনে আমরা রীতিমতোই আলোড়িত হই, তরঙ্গায়িত ভাবের উদ্বেলিত উচ্ছ্বাস নিবেদিত মাহফিল, জলসা, সেমিনার, নাত উৎসব ও স্মরণিকা প্রকাশসহ নানাজাত আয়োজনে মুখর হয়ে ওঠে আমদের চারপাশ। আমরাও হৃদয় মন প্রাণ খুলে দিয়ে শরীক হই সেই প্রাণের বসন্তে। এবং এটা ঈমানের দাবীও। অতঃপর হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণে আন্দোলিত হই, স্পন্দিত হই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ত্ব ও কৃতিত্ব বর্ণনায়। যুক্তি তর্ক বিশ্লেষণে প্রাণবন্ত করে তুলি সকল প্রাঙ্গণ। কিন্তু যেকথা স্মরণ করতে ভুলে যাই, ভুলে যাই অমোঘদাবী সে হলো, সেই শ্রেষ্ঠ নবীর সাথে আমাদের বন্ধনটা কী? আর সেই বন্ধনের মূল উৎসটাই বা কী? অতঃপর সে বন্ধন, কাঙ্খিত দাবী পূরণে আমরা কতটা সচেষ্ট রয়েছি সেই কথা বলতে যেন বড়ই কুণ্ঠিত হই প্রতিনিয়তই। ফলে প্রাণের সাড়া নিয়ে নিয়তই আসে বসন্ত রবিউল আউয়াল। আমরা ভালোবাসার বর্ণমালা দিয়ে গ্রহণ করি প্রিয় নবী স্মৃতিধন্যকালের এই হিরক খন্ডটিকে! সঞ্চিত প্রেমে গচ্ছিত বাণীমালা দিয়ে অপার আগ্রহে বরণ করে নিই। মিলাদ, নাত, গজল, মাহফিল আর হৃদয়োৎসারিত কবিতা আবৃত্তি করে প্রশমিত করি প্রাণের জ্বালা। কিন্তু যেহেতু প্রেমের সেই পবিত্র প্রসঙ্গকে সমাদরে বয়ে আনি না আমাদের জীবন প্রাঙ্গণে, খুঁজে দেখতে চাই না শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মাহ হিসাবে আমাদের কতর্ব্য প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির হিসাব-কিতাব; তাই আমাদের হৃদয়ের জ্বালা প্রশমিত করতে পারলেও জীবনের আগুন নেভাতে পারি না। ফলে আমরা জ্বলে অঙ্গার হই ব্যক্তি সমাজ রাষ্ট্র সকল অঙ্গণে। জ্বলে জ্বলে আমরা এখন ছাই-ভস্ম হয়ে পড়ে আছি। আমাদের নীচে পড়ে আছে মানবতার পোড়া দেহ। আর আমাদের বুকের উপর দিয়ে প্রতিক্ষণ বয়ে চলে বেঈমানদের উল্লসিত মিছিল। ছাই-ভস্মের কি কোন অনুভূতি থাকে? থাকে না। নেই আমাদেরও! ছাই ভস্মরা যেমন বাতাসে উড়ে বেড়ায় লক্ষ্যহীনভাবে আমরাও তেমনি উড়ছি।

তিন.

অথচ আমাদের সৃষ্টিতো আকাশে বাতাসে উড়ে বেড়ানোর জন্যে ছিল না। এই মাটির পৃথিবীকে আবাদ করার জন্যেই তো একদা বেহেশত থেকে নেমে

www.almodina.com

এসেছিলেন বাবা আদম আলাইহিস সালাম। মাটির পৃথিবীতে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠার যে মহান বার্তা নিয়ে আগমন করেছিলেন বাবা আদম [আ.] যুগে যুগে সকল নবী রাসূল বহন করে বেরিয়েছেন সেই একই পতাকা। খোদার দুনিয়ায় খোদার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা মহামহিম তকবীর ধ্বনিই তো যুগে যুগে উচ্চারণ করে গেছেন নূহ, শীশ, ইদরীস, ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, মূসা, হারুন, সুলাইমান, দাউদ আর ঈসা [আলাইহিমুস সালাম]সহ সকল কালের সকল পয়গাম্বর, তাঁদের জানবাজ সঙ্গীগণ ও সকল কালের সকল মর্দে মুমিন!

কালের আবর্তে একদা যখন হারিয়ে যায় সেই মহান পতাকার মিছিল, স্তিমিত হয়ে পড়ে যখন মহান সেই তাকবীর ধ্বনি তখন জগতে আগমন করেন সকল কালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হাতে তুলে নেন পতাকা নব বিশ্বাসে। নব উদ্যমে উচ্চারণ করেন সেই শাশ্বত তাকবীর- আল্লাহ এক, আল্লাহ এক।

কিন্তু একাতো আর মিছিল হয় না। তাই তাঁর সে মহান পয়গামকে সমর্থন, সাহায্য ও সাধনা দিয়ে পূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে সৃষ্টি করলেন আরেক বিশাল উম্মাহ! অতঃপর তিনিই তাদের দায়িত্ব বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার কথা বলে দিলেন তাঁর পাক কালামে। ইরশাদ করলেন-

'কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস..

তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ! তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্যে। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবে, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। [আলে ইমরান : ১১০]

উল্লিখিত আয়াতটিতে চারটি কথা বিধৃত হয়েছে। ১. মুসলমানগণ হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ। এটি হলো এই উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার এক বিরল ও অবিস্মরণীয় স্মারক। উম্মাহ যদি এই একটি বাণীর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ হাজার বছর সিজদায় পড়ে থাকে তবুও তার হক আদায় হবে না। মহান সৃষ্টিকর্তা মালিকের পক্ষ থেকে এত বড় ঘোষণার জন্যে এই জাতি যতোই গর্ব করুক তা খুবই সামান্য।

গর্ব ও মর্যাদার এই বিস্ময়কর ঘোষণার পাশাপাশি মহান মালিক এর কারণও উল্লেখ করে দিয়েছেন একই সাথে। তাই আয়াতের পরবর্তী অংশে উম্মাহর তিনটি কর্ম ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা- ১. এই উম্মাহ সৎ ও কল্যাণকর্মের আদর্শ করবে; ২. অন্যায় কর্মে বাধা দান করবে ও ৩. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও ঈমান রাখবে। কথা কটি বেশ ছোট কিন্তু এর ফলাফল খুবই গভীর ও ব্যাপকতর। কারণ কল্যাণকর্মের দাওয়াত, আদেশ ও চর্চার মাধ্যমেই তো কল্যাণময় সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত হয়। অতঃপর কল্যাণ বিরোধী সকল অন্যায় তৎপরতাকে প্রতিহত করতে হয় সেই কল্যাণী সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থিতি ও

www.almodina.com

নিরাপত্তার জন্যে। আর একাজ করতে গেলেই যে কঠিন বাধার সম্মুখীন হতে হয় সে জন্য বিশ্বাস রাখতে হয় আল্লাহর উপর। কারণ আল্লাহর পথের সৈনিকদের বিজয় ও সফলতার প্রধান ভিত্তিই হলো ঈমান- আল্লাহ বিশ্বাস। ইসলামী ইতিহাসের অতি সাধারণ পাঠকও জানেন, সৎকর্মের আদেশ, অন্যায় কর্মে বাধা দান আর বিশ্বাসী শক্তির উপর ভরসা করে রচিত হয়েছিল ইসলামের প্রাথমিক কালের এক বিস্ময়কর সোনাঝরা ইতিহাস। যে ইতিহাস আজো মানব জাতির জন্যে এক মহা বিস্ময়ের আকর। বিস্ময়কর সে ইতিহাস পড়ে আজো বস্তুবাদের খাঁচা ভেঙ্গে ডানা ঝাপটে উড়ে আসছে কত নববিশ্বাসী- সম্ভবত সে হিসাব সবচে' ভাল ফেরাউন রাষ্ট্র আমেরিকা জানে।

চার.

প্রশ্ন হলো, এই আমরা যারা আজ সেই গর্বিত উম্মাহর সদস্য তারা কি সেইসব বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি? কেউ যদি তর্কের খাতিরে বলেন, আছি তো। এই তো আমরা নানাভাবে নানা ক্ষেত্রে মানুষকে কল্যাণের কথা বলি, অকল্যাণে বাধাও দিই। কাঁপিয়ে তুলি আকাশ পাতাল আর ঈমানতো পেয়েছি পৈত্রিক সূত্রেই। ওটা এখন রক্তের অংশীদার। কোনভাবেই বিয়োগ করা যাবে না। আমি বলি, প্রথমে দেখা দরকার ওই ঈমানের প্রসঙ্গটিই! আল্লাহর পক্ষ থেকে আনীত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত ইসলাম নামক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাসকেই তো ঈমান বলে এবং এই ঈমানই মুসলিম উম্মাহর সবচে' বড় ও প্রধান সম্পদ। মহান এই ঈমানের ফলাফল কি? পার্থিব জগতে এর ফলাফল সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা ঈমানদার হও।

অতঃপর মহান এই ঘোষণার সত্যায়নে ঈমানের জোরে বিজয়ের ইতিহাস সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত। অথচ আজ আমরা যেদিকেই তাকাই দেখি শুধু পতনের ঢেউ, ভয়ংকর তরঙ্গ। না না, ফিলিস্তিন, বসনিয়া, কাশ্মীর আর ইরাকে যেতে হবে না। এর ভুরি ভুরি উপমা তো এদেশেই বিদ্যমান। এনজিওদের বিপ্লবে আমরা পরাজিত; কাদিয়ানীদের কপালে এখনো 'কাফের' তিলক বসাতে পারলাম না, নতুন নামে মদ 'হালাল' হলো, ঠেকাতে পারলাম কি? ওসব কথা বলতে গেলে গিরগিটরা যদি চেঁচিয়ে ওঠে 'খামোশ'। আমরাও বিনয়ের সাথে বলি আজ্ঞে, খামোশ।

একি আমাদের বিজয়ের লক্ষণ না পরাজয়ের বিবরণ? বিবরণের এই ফিরিস্তি দেয়াও এখন নিষিদ্ধ। দুটো খুচরো পয়সা চুরি করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়ে পকেটমারকে অকাতরে জীবন দিতে হয় আর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে আরাম কেদারায় বসে দেশ ও জাতির কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে 'মহাশ্রদ্ধা' কর্তায় রূপান্তরিত হন যে নিয়মে এই নিষেধও চলে সেই একই নিয়মে। নিয়ম! আরে

www.almodina.com

তুই থাকতে আর অন্তত হাবিয়া দোযখকে রিযিকের কথা ভাবতে হবে না।

পাঁচ.

সবশেষে যে কথাটি বলতে চাই তাহলো, দেড় হাজার বছরের অতীত ঐতিহ্যমন্ডিত এই উম্মাহ শেকড়ছিন্ন কোন জাতি নয়। বিজয় ও পতনের বহু ঘাত-প্রতিঘাত পেছনে ফেলে এখনো এগিয়ে চলেছে উম্মাহ পায়ে পায়ে। এখনো গভীর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসা নতুন নতুন আলোর মিছিলের সংবাদ পাই খোদ আঁধারবন্ধু বেঈমানদের পাতা ইলেক্ট্রনিক্স কণ্ঠেই। সংবাদ পাই, যেখানেই উম্মাহর সদস্যগণ ব্যাপকভাবে কল্যাণের দাওয়াতে নেমেছেন; নিজেদের চিন্তা বিশ্বাস ও কর্মকে তাঁদের নবীর আদর্শের আদলে পুনঃনির্মাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন বা হচ্ছেন পার্থিব সকল প্রয়োজনকে 'প্রয়োজন'-এর মাত্রায় রেখে, দীনকে যারা জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাদের হাতের ছোঁয়ায় বদলে যাচ্ছে তাদের চারপাশ। যেভাবে বদলে গিয়েছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদের পদছোঁয়ায় সমকালীন আরববিশ্ব।

বর্ণিত আছে, অভিশপ্ত ইবলীস জীবনে চারবার কেঁদেছিল। প্রথমবার আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিশপ্ত হবার পর এবং সেটা বাবা আদমকে সিজদা না করার অপরাধে। দ্বিতীয়বার বেহেশত থেকে বহিস্কৃত হবার পর এবং সেটা বাবা আদমকে ধোঁকা দেবার ফলস্বরূপ। তৃতীয়বার কেঁদেছিল আমাদের প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভ জন্মক্ষণে- যখন কুল মাখলুক মাতোয়ারা ছিল মহাখুশিতে, মহাআনন্দে, মহাউল্লাসে। শয়তান আরেকবার কেঁদেছিল যখন সূরা 'ফাতিহা' অবতীর্ণ হয়।

প্রিয় পাঠক! আজো চারদিকে কান পাতলেই শুনি কান্না। সে কান্না শুধুই মুমিনদের। মুমিনদের কান্না শোনে যখন হিম হয়ে পড়ি তখনই আবার চরম আতংকে আঁতকে উঠি বেঈমানদের অট্টহাসিতে। শয়তানের মানস সন্তানদের অট্টহাসির ভেতর বসে আর কতকাল গাইব সীরাতুন্নবীর গজল? এই কান্নার দীর্ঘ রজনী কি পোহাবে না? নীলাভ এই আসমানের নীচে হেলালী নিশান কি আর উড়বে না? তাই আসুন, আসন্ন সীরাতুন্নবীর মাসে প্রথমকালের মুসলমানদের মতো আমরা আমাদের নবীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উম্মাহ হিসাবে গড়ে তুলবার শপথ নিই, একটি কঠিন ও ব্যাপক শপথ- যে শপথবাণী উম্মাহর মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার করবে আর কাঁদতে বাধ্য করবে শয়তান ও তার মানসপুত্রদেরকে- যেভাবে কেঁদেছিল শয়তান আমাদের প্রিয়তম নবীর শুভ জন্মক্ষণে। সন্দেহ নেই, এটাই এই সময়ে সীরাতুন্নবীর সবচে' বড় পয়গাম। [২৩ মার্চঃ ২০০৫ ঈ.]

www.almodina.com

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং ইহুদী ষড়যন্ত্র

আল্লাহ্ তাআলার সর্বশেষ ও শাশ্বত পয়গাম নিয়ে যখন হযরত মুহাম্মদ মুসতাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবির্ভূত হন তখন ইহুদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত। সবিশেষ সুদ, ব্যবসা, বাণিজ্য ও দাস কারবারের সুবাদে বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছে তাদের আস্তানা। একই সুবাদে অর্থনৈতিক সূত্রে সকল অঞ্চলের স্থানীয় সমাজ জীবন জীবিকার উপকরণ ও বাণিজ্যিক মাতব্বরিটা ছিল তাদের কব্জায়। জীবিকা ও বাণিজ্যিক এই প্রভাব ও সুবিধাটাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থ ও বড়ত্বকে যেমন স্থায়ী পোক্ত করতে কুণ্ঠিত হতো না, তেমনি সমাজে অন্য নাগরিকদেরকে মূর্খতা দারিদ্র ও পশ্চাৎপদতার নিগড়ে বেঁধে রাখতেও একবিন্দু আলসেমী করতো না তারা। এতে করে অন্যরা যেমন পতিত জীবনের গভীর থেকে গভীরে নিক্ষিপ্ত হতো তেমনি তারা হতো উঁচু থেকে উঁচুতে প্রতিষ্ঠিত। কূট-কৌশল, চাতুর্য ও ধূর্তুমীর মহাকারিগর এই ইহুদীরা তখন নিজেদেরকে সমাজ নিয়ন্তা হিসাবে সগর্বে তুলে ধরে বিদ্রুপ করতো ভাগ্যাহতদের অসহায়ত্ব নিয়ে। মানব ও মানবতার সে এক দারুণ নিদান কাল। মানবতার এই ঘনসংকট কালেই আবির্ভূত হলেন সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি এলেন মানবতার মুক্তির পয়গাম নিয়ে। ছোট-বড়, ধনী-গরীব, সাদা-কাল, উপর-নীচ, শাসক-শাসিত বলতে যত রকমের শৃংখল আছে তার সবকটি শেকল ছিঁড়ে একটি সভ্য সরল সমতল মানব সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। যেখানে বড় থাকবেন কেবল আল্লাহ আর সকলেই হবে সমান এক আল্লাহর দাস!

সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাঠকমাত্রই জানেন, প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর প্রতি সর্বপ্রথম যখন ওহী আসে তিনি তাতে কম্পিত হন। ভেতরে ভেতরে আলোড়িতও! তখন জীবনসঙ্গিনী হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.) নিয়ে যান তাঁকে মক্কার বিশিষ্ট ধর্মগুরু সন্ন্যাসী ওরাকা ইবন নওফিলের কাছে। বিজ্ঞ রাহিব ওরাকা তখন স্বীকার করেছিলেন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সেই নবী ইহুদী-খৃষ্টানরা যার অপেক্ষায় আছে।

এও সুবিদিত, মক্কায় প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখোমুখি

www.almodina.com

ছিলেন মুশরিক ও পৌত্তলিকদের। মদীনায় হিজরতের পরই সর্বপ্রথম তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখোমুখি হোন ইহুদীদের। মদীনার পাশেই সুরক্ষিত কেল্লার আকারে ইহুদী বাড়ি ঘর। সুদী লেন-দেন, কায়-কারবার, চিকিৎসা বিদ্যা আর স্বভাবজাত কলা-কৌশলের ভিত্তিতে তাদের অবস্থান ছিল বেশ পোক্ত। মদীনার সমাজ ব্যবস্থার বলা যায় 'দাদা' ছিল তারা। তারা মদীনার লোকদেরকে মারামারি করাতো, দলাদলিতে ফাঁসিয়ে দিয়ে 'কৌশল' চালাচালি করতো। সরল বাসিন্দারা হতো বলির পাঁঠা।

মদীনা সনদ

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনায় আগমন করলেন তখন ইহুদীদের তিনটি গোত্র বনূ নাযীর, বনূ কাইনাকা, বনূ কুরাইজা বাস করতো মদীনার পাশে। বসবাসের জন্যে তাদের শক্তিশালী কেল্লা ছিল, উঁচু উঁচু গম্বুজ ছিল। মদীনায় আরও বসবাস ছিল আউস খাযরাজ নামক দুটি কবীলার। ইহুদীদের ষড়যন্ত্রে এদের মধ্যে লড়াই লেগেই থাকতো। 'জঙ্গে বুআছ' নামে পরিচিত সর্বশেষ যুদ্ধটি যে তাদের মধ্যে হয় তাতে উভয়গোত্র ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক রকম রণক্লান্ত হয়ে নিরুপায় মনে কোন শান্তি ছায়ার প্রত্যাশায় চোখ বুঝে থাকে। তখনই আগমন হয় প্রিয়তম নবী, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তিদূত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় থাকাকালীন অবস্থায় ইহুদীদের সংঘাতে আক্রান্ত না হলেও তাদের চক্রান্তে বার বার ঝাকুনি খেয়েছেন। তারা রীতিমত মক্কার মুশরিকদেরকে হযরতের পেছনে লাগিয়ে রাখতো। আসাহাবে কাহ্ফ, যুলকারনাইন, রুহ ইত্যকার জটিল বিষয়ে প্রশ্ন করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বিব্রত করার পরামর্শ দিত। কারণ, সেখানে নেতৃত্ব ছিল কোরেশদের। সম্ভ্রান্ত কোরেশদেরই এক অভিজাত সন্তান মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাই তাঁকে সরাসরি উত্যক্ত করার ক্ষমতা ও সাহস সেখানে তাদের ছিল না। তাই কৌশলে আক্রান্ত করার চেষ্টা করতো সর্বদাই। এ কারণে, তাদের ধূর্তস্বভাব, চক্রান্তজাত মন আর ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্যক অবগত। অধিকন্তু তিনি মদীনায় এসে এও লক্ষ্য করলেন, ইসলামের প্রতি সমর্পিত দুই কবীলা আউস ও খাযরাজের মধ্যে লড়াই বাঁধাবার জন্যে পরস্পর বিবাদ সৃষ্টি ও দূরত্ব নির্মাণের নেশায় ইহুদীরা সারাক্ষণ ঘুর ঘুর করছে। তাই তিনি পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত, শান্তিময়, সহনশীল ও সৌহার্দ্যপূর্ণ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ইহুদীদের সাথে একটি লিখিত চুক্তি করেন। শান্তি প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে তাঁর এই চুক্তি সাধন একটি ব্যতিক্রমধর্মী অবদান। এই চুক্তির

www.almodina.com

সার সংক্ষেপ ও উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো হলো-

১. অত্র অঞ্চলের সকল বাসিন্দা একই জাতি হিসাবে বিবেচিত হবে। মুসলমান ও ইহুদীরা মিলে একটি মাত্র গোত্র। কেউ কারো থেকে আলাদা নয়।

২. চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়গুলোর যে কারও সাথে যদি অন্য কোন দল বা গোষ্ঠী যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে সকলে মিলে তাদের প্রতিহত করবে।

৩. চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়গুলোর পরস্পর সম্পর্ক হবে পারস্পরিক কল্যাণ কামনা, একে অপরের উপকার সাধন ও সহযোগিতা ভিত্তিক। পাপ কিংবা অপরের ক্ষতিসাধন নয়।

৪. যুদ্ধকালীন সময়ে ইহুদীরাও মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে এবং আনুপাতিক হারে খরচও বহন করবে।

৫. ইহুদীদের বন্ধু সম্প্রদায়গুলোর অধিকারগুলোও তাদের অধিকারের মতোই বিবেচিত হবে।

৬. কোন ব্যক্তি সন্ধিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কারও সাথে শত্রুসুলভ কোন আচরণ করতে পারবে না।

৭. মযলুম নিপীড়িতদের সকলেই সাহায্য করবে।

৮. চুক্তিবদ্ধ সকলের জন্যেই মদীনার ভেতরে ফ্যাসাদ সৃষ্টি এবং খুনোখুনি করা সম্পূর্ণ হারাম ও অবৈধ।

৯. মদীনায় আশ্রিত ব্যক্তিরাও চুক্তিবদ্ধদের মতো বিবেচিত হবে।

১০. চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে যদি এমন কোন ঘটনা কিংবা ঝগড়া সৃষ্টি হয় যাতে ফ্যাসাদ সৃষ্টির আশংকা থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ‘সালিস’ হিসাবে উভয়পক্ষ মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

জানুয়ারী ৬২৩ সালে সংঘটিত-সম্পাদিত এই চুক্তির ভিত্তিতে এবং মুসলমান ও ইহুদী সম্প্রদায়ের সংঘবদ্ধতায় প্রতিষ্ঠিত হয় একটি শান্তিপূর্ণ নীরব নিরাপদ সমাজ ব্যবস্থা। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই লিখিত শান্তি চুক্তির পরশে বদলে যায় মদীনার রুদ্ররূপ। মদীনা হয় শান্তির শহর।

অবশ্য এই কারণে যে ইহুদীরা সভ্য বনে যায় এমনটি ধারণা করারও কোন আবকাশ নেই। কথায় আছে, কয়লা ধুলে কি আর ময়লা যায়? তাই গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে হৃদয়ে চিন্তায় ষড়যন্ত্র দূরভিসন্ধি ও চক্রান্তের ধারা তারা ঠিকই অব্যাহত রাখে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন উপলক্ষে যা মূর্ত হয়ে উঠে।

বদর যুদ্ধ এবং ইহুদী গোষ্ঠী

অবশ্য প্রথম হিজরতের পর আবিসিনিয়ায় কোরেশদের প্রতিনিধি দল প্রেরণ,

www.almodina.com

শিয়াবে আবিতালিবে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্বজনদের সাথে মক্কাবাসীর বয়কট অতঃপর বদর যুদ্ধ পর্যন্ত প্রবাহিত মক্কার মুশরিকদের নানা ষড়যন্ত্র, অন্তরালের ঘটনাবলীর আলোকে ইহুদীরা ধরেই নিয়েছিল, এই প্রবাসী বিপ্লবের ধারা খুব বেশি দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারবে না। বরং খুব শীঘ্রই এই প্রদীপ নিভে যাবে। তাই তারা মানসিকভাবে বেশ তৃপ্তই ছিল। অবশ্য সেই সাথে মক্কাবাসীর সাথে গোপন যোগাযোগ, শলা-পরামর্শ, ষড়যন্ত্রের ধারা কখনোই বন্ধ করেনি। এক্ষেত্রে বিশ্বস্ত মিডিয়া হিসাবে রাইসুল মুনাফিকিন আবদুল্লাহ ইবন উবাই'র গুরুত্বও ছিল অপরিসীম। অথচ তারা জানতো না আল্লাহর সিদ্ধান্ত ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

"তারা চায় ফুৎকার দিয়ে আল্লাহ'র আলো (ইসলাম)কে নিভিয়ে দিতে অথচ আল্লাহ তাঁর আলোকে পরিপূর্ণ করবেনই। যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।"

আর সেই পরিপূর্ণতা, প্রতিষ্ঠা ও বিজয়ের প্রথম ভিত্তি হলো বদর যুদ্ধের বিজয়। ইসলামের বিজয় প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ইতিহাসে বদর যুদ্ধের বিজয় একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এবং সবিশেষ বদর যুদ্ধের বিজয়ের ঘটনা এই কারণে তাৎপর্যপূর্ণ যে, এতে করে ইহুদীরা একটি শক্ত ধাক্কা খায়। তাদের দুঃস্বপ্নের লজ্জাজনক পতন তাদের ভাবনা শক্তিকে পর্যন্ত বরফ বানিয়ে ফেলে কিছু কালের জন্যে।

এ বিষয়ে (নাউযুবিল্লাহ) তাদের কোন সংশয়ই ছিল না, কুরেশদের সংঘবদ্ধ আঘাতে ইসলামের অস্তিত্ব ধুলির সাথে মিশে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা দাঁড়ালো তার উল্টো! তখন আকাশ যেন তাদের মাথায় ভেঙ্গে পড়ল। কারণ, মদীনা সনদে স্বাক্ষর করার সময় তাদের ধারণা ছিল, 'তারাতো কয়েক দিনের অতিথি মাত্র, কিন্তু বদর যুদ্ধে জয়ের পর দেখা গেল, মুসলমানগণ শুধুমাত্র ধর্মানুসারী একটি জাতিমাত্র নন। বরং রাজনৈতিক পুষ্টিতে সমৃদ্ধ এক সামরিক বিজয়ী শক্তি তাঁরা। তারা এও লক্ষ্য করল, মদীনার সনদ মুসলমানদের বিজয় প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের পথ সুগম করছে। ত্বরান্বিত করছে একটি সুন্দর সুশীল বলবান 'ইসলামী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার পথকে। তারা ভাবল, বিজয় ও অর্জনের ক্রম অগ্রসরমান এই ধারাকে বাধাগ্রস্ত করতে হলে যে কোন মূল্যেই হোক 'কৃত সনদ'টি ভেঙ্গে ফেলতে হবে। তারপর শুরু হলো কৌশলে সেই পথে যাত্রা।

ইহুদী নেতা কাব ইবন আশরাফ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, বদরে মুসলমানদের বিজয় হয়েছে একথা শোনতেই সে এই বলে চিৎকার করে উঠেছিল- 'এর চাইতে বরং মরে যাওয়াই আমাদের জন্য উত্তম ছিল।' তারপর সে কয়েকজন সতীর্থকে সঙ্গে করে মক্কায় চলে যায় এবং মক্কার নারী-পুরুষ আবাল, বৃদ্ধ, বণিতা

www.almodina.com

সকলকেই স্বজনদের রক্তের প্রতিশোধ নেবার জন্যে ক্ষেপিয়ে তুলতে থাকে। বেদনা-বিধূর সুরে মর্সিয়া পাঠ করে করে মানুষকে হিংসা বিদ্বেষ ও প্রতিশোধের জ্বালায় মাতাল করে তোলে!

তার সেসব রক্তবর্ণ শোকগাঁথার কয়েকটি শ্লোক ছিল এমন-

'বদরের চাকা তোমাদের যুবকদের বদন পিষে ফেলেছে,
তাদের লহুতে লাল হয়েছে প্রান্তর-
বদরের স্মরণে কাঁদো, অশ্রু বিসর্জন দাও!
তোমাদের নামী-দামী বীরদের মস্তক খন্ডিত হয়েছে,
বদরে পড়ে আছে তোমাদের রাজপুত্রদের বেওয়ারিশ লাশ-
আহা, কত সুন্দর, বীর্যপূর্ণ, সম্ভ্রান্ত ছিল তারা
অসহায়দের, নিঃস্বদের আশ্রয় সেই মহানজনা পড়ে আছে বদরে।
খাজানা উজাড় করে যারা দান করত, মহাদুর্ভিক্ষের কালে-
তারাইতো ছিল রিক্তজনদের ঠিকানা!
আহা, তারা যখন মরে গেল তখন মাটি কেন বিদীর্ণ হলো না,
গিলে ফেলল না কেন তার অসহায় সন্তানদেরকে!'

এভাবে নানা রকমের শোকগাঁথা লিখে কুরাইশদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগল এই কাব ইবন আশরাফ। আর বদর যুদ্ধ নামটিই একটি জ্বলন্ত হাবিয়া দোযখ হয়ে জ্বলতে লাগল সমগ্র ইহুদীদের অন্তরাত্মায়।

বনূ কায়নাকার ষড়যন্ত্র

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রণাঙ্গনে যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত, বদর প্রান্তরে আল্লাহ'র পথের মুজাহিদদের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে আকণ্ঠ নিমগ্ন মদীনা তখন ইহুদীদের ষড়যন্ত্রে বিষাক্ত। তারা নানা কৌশলে মুসলমানদের সংকীর্ণ করতে সচেষ্ট। সবিশেষ বদর যুদ্ধে কুরাইশরা নির্লজ্জের মত হেরে গিয়ে হাতে চুড়ি পরার দশা- একথা শোনে যেন তারাও শংকিত। কারণ, এই যুদ্ধে এটাই প্রতিভাত হয়ে ওঠেছিল ইসলাম একটি 'পাওয়ার'।

ইহুদীদের মধ্যে বনূ কায়নাকা ছিল শক্তিতে বেশ বীর্যবান। অনেকটা লড়াকু টাইপের। তাই তারাই ইসলামী শক্তি ও আশু উত্থানের কথা ভেবে ভবিষ্যত চিন্তায় 'মদীনা সনদে'কৃত অঙ্গীকারটি ভেঙ্গে ফেলার চিন্তা করল। যথারীতি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণাও দিয়ে বসল।

আকস্মিক একটি ঘটনা তাদের ভয় শংকা দ্বেষ ও হিংসার এই অগ্নিকে আরও তাপিত করে দিল। তাহলো, একবার এক আনসারী সাহাবিয়্যা নারী এক ইহুদী দোকানে সওদা আনতে গেলে ইহুদী তাকে অপমান করে বসে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে

www.almodina.com

এক আত্মমর্যাদাদীপ্ত মুসলমান সেই ইহুদীর উপর হামলা করে বসে এবং তার একটি দাঁত ভেঙ্গে ফেলে। ঘটনায় সমগ্র মদীনাই নড়ে চড়ে ওঠে। উত্তেজনা সর্বত্রই টানটান।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো যুদ্ধে। বদর থেকে ফিরে এসে শোনলেন সব। তিনিও খুবই মর্মাহত হলেন ইহুদীদের বিদ্বেষী আচারণে। তাই তিনি তাদেরকে ভৎসনা করলেন। এতে তারাও ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং প্রকাশ্যে হুমকির সুরে বলে দেয়, আমরা কুরাইশ নই। আমাদের পল্লায় পড়লে তখন দেখিয়ে দেব লড়াই কাকে বলে!

বলার অপেক্ষা রাখে না, তাদের এই বক্তব্য শুধু চুক্তি ভঙ্গেরই শামিল নয় বরং পরিষ্কার ভাষায় যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পাল্টা প্রস্তুতি নিলেন। হিজরী দ্বিতীয় সালের শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়ে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদেরকে ঘেরাও করে বসলেন। ঘেরাও কর্মসূচি পনের দিন বহাল রইল। অবশেষে মুসলমানদের ভয়ে শংকায় বনূ কায়নাকাও বেশ প্রভাবিত হলো এবং বিনাশর্তে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আত্মসমর্পণ করে। মুনাফিকদের প্রধান আবদুল্লাহ ইবন উবাই ও সাহাবী হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা.)-এর সুপারিশে জানে বেঁচে গেলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নির্বাসনের নির্দেশ দেন!

বনূ নাযীর-এর ঔদ্ধত্য

এদিকে বিখ্যাত দুই কবীলা বনূ কিলাব ও বনূ নাযীরের সাথে ঝগড়া বাঁধে। তাতে বনূ কিলাবের দুইজন ব্যক্তি মারা যায়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বনূ কিলারের সাথে যেহেতু আমাদের চুক্তি আছে। তাই তাদেরকে রক্তমূল্য দিতে হবে। বনূ নাযীর হলো ইহুদী গোত্র। বনূ কিলাবের সাথে তাদেরও চুক্তি ছিল। তাই বিষয়টি মীমাংসা করার উদ্দেশে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ নাযীরে গমন করলেন। সঙ্গে আছেন হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত আলী (রা.) সহ আরও কয়েকজন সাহাবী।

জাতদুষ্ট বনূ নাযীরের লোকেরা বাহ্যত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাতির করলেও অন্তরালে একটি ফন্দি আঁটল ভয়ানক। তারা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কথা বলার জন্যে দেয়ালের ধারে একটি স্থান নির্ধারণ করলো। কিন্তু গোপনে তাদেরই একজনকে এই মর্মে নিযুক্ত করলো, তুমি ভারি একটি পাথর নিয়ে ছাদের উপর প্রস্তুত থাকবে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন গভীরভাবে কথায় নিমগ্ন হবেন

www.almodina.com

তখন পাথরটি এমনভাবে ছুঁড়ে মারবে যাতে সেখানেই ঘটনার সমাপ্তি ঘটে। কারণ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেঁচে থাকলে আর আমাদের রক্ষা নেই। অবশ্য তাদেরই একজন সালাম ইবন মুশাককাম পরামর্শ দিয়ে বলল- 'তোমরা কখনও এই কাজ করতে যেও না! খোদার কসম, আল্লাহ তাঁকে সব জানিয়ে দেবেন। তাছাড়া এটা একটা মন্দ কাজও বটে।'

ইহুদীরা ভালো কথা শোনার জাত নয়। তাই আমর ইবন হাজ্জাশ নামক এক ইহুদীকে পাথরসহ ছাদে পাঠিয়ে দিল। আর ইত্যবসরেই মহান মালিক আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহুদীদের ভয়ানক ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত করে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় চলে যান। কিন্তু যাওয়ার ধরন ছিল এমন যেন তিনি আকস্মিক কোন প্রয়োজনে সামান্য সময়ের জন্যে ওঠে যাচ্ছেন। অবশ্য চলে যাবার পর ইহুদী পন্ডিত কিনানা ইবন হুয়াইরা পরিষ্কার ভাষায় বলেই ফেলল : শোন, আসলে আল্লাহ তাআলাই তাঁকে তোমাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তাই তিনি চলে গেছেন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সাহাবীগণও মদীনায় চলে এলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বিষয়টি খুলে বললেন! সেই সাথে তারা যে কল্যাণের পথে ওঠে আসবার উপযুক্ত নয় এটাও পরিষ্কার হয়ে ওঠল। সাহাবীগণ এহেন ষড়যন্ত্রের কথা শোনে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ, অনলদীপ্ত। আর ছাড় দেবার যুক্তি নেই। তখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ নাযীরের লোকদেরকে চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়ে বললেন- তোমাদেরকে সর্বোচ্চ দশ দিনের সময় দিচ্ছি। এর মধ্যেই তোমরা মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবে। এরপর তোমাদের যাকেই পাওয়া যাবে তাকেই হত্যা করা হবে।

বনূ নাযীর এই শর্ত মানতে প্রস্তুত এবং বাধ্য ছিল। কিন্তু মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাই বলল : তোমরা চলে যাবে কেন! কিছু হলে বনূ কুরাইযা এবং বনূ গিতফান তোমাদেরকে সাহায্য করবে। আর আমিও দুই হাজার সৈন্য পাঠিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করব। এই আশ্বাস পেয়ে বনূ নাযীর আবার বেঁকে বসল।

এদিকে মুসলমানগণতো আগে থেকেই উত্তপ্ত। তারা নির্বাসনের আদেশ মানতে অস্বীকার করায় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতির আদেশ দিলেন। আদেশ মাফিক ৬২৫ খৃষ্টাব্দ সেপ্টেম্বরে বিখ্যাত অন্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম (রা.)কে মদীনার গভর্ণর করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ নাযীরের দিকে রওনা হন। এই যুদ্ধে ইসলামের পক্ষে পতাকা গ্রহণ করেন হযরত আলী (রা.)। রাসূল সাল্লাল্লাহু

www.almodina.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ নাযীরকে ঘেরাও করে ফেলেন! অবরুদ্ধ বনূ নাযীর-এর সাহায্যে যারা আসার কথা ছিল মুসলমানদের ভয়ে তারা সকলেই 'আপন জান বাঁচা' বলে ঘরে বসে রইল।

অবস্থা বেগতিক দেখে তারা নতুন ষড়যন্ত্রের কথা ভাবল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রস্তাব করল, আপনার সাথে আমাদের ইহুদী পন্ডিতদের বিতর্ক হবে। তাই আপনি আপনার তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে আমাদের এখানে আসুন। আমাদের পন্ডিতরা যদি পরাজিত হয়ে মুসলমান হয়ে যান তাহলে আমরাও মুসলমান হয়ে যাব। মুখে এই প্রস্তাব জানালেও তাদের ভেতরের সিদ্ধান্ত ছিল সম্পূর্ণ উল্টো এবং ইতরতম। তারা তাদের ইহুদী আলেমদেরকে বলল- তোমরা তোমাদের কাপড়ের নীচে বিষাক্ত খঞ্জর লুকিয়ে রাখবে। অতঃপর সাক্ষাতের সময় সুযোগ বুঝে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ করে দিবে।

পরম দয়ালু আল্লাহ পূর্ব থেকেই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দেন। অতএব, এবারও ভেস্তে গেল সব স্বপ্ন। সামনে সতরঙ্গ বইয়ে চলল কেবল মিথ্যা মরীচিকার ঢেউ।

অবরোধ পনের দিন পর্যন্ত বহাল রইল। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিলেন এদের বাগানের গাছপালা কেটে দাও। জ্বালিয়ে দাও। অবশেষে চরম অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে তারা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে নিরাপত্তা কামনা করে। রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আবেদন এবারও মঞ্জুর করেন এবং বলে দেন, দশ দিনের মধ্যে চলে যাবে। যাওয়ার সময় যুদ্ধাস্ত্র ব্যতীত নিজের পরিবার-পরিজন এবং ব্যবহারের সামান পত্তরও নিয়ে যেতে পারবে। তারা এই অনুমতির সৎ ব্যবহার করে। এমনকি ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত খুলে সঙ্গে নিয়ে যায়। এই আদেশের অধীনে মদীনায় বসবাসরত অধিংকাংশ ইহুদী মদীনার উত্তরে প্রায় দুইশ' মাইল দূরে অবস্থিত 'খায়বার' অঞ্চলে গিয়ে নির্বাসিত হয়। অভিশপ্ত ইহুদীদের প্রতি রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই সিদ্ধান্ত ছিল সমকালীন মুসলিম মিল্লাতের জন্য এক অনিবার্য প্রয়োজন।

বনূ কুরাইজার গাদ্দারী

বনূ কায়নাকা নির্বাসিত। নির্বাসিত বনূ নাযীরও। মদীনার উপকণ্ঠে ইহুদী বলতে আছে শুধু বনূ কুরাইজা। সতীর্থদের, স্বজাতিদের ভাগ্যদর্শনে তারাও নিজেদের অবস্থান ও ভবিষ্যত নিয়ে ভাবছিল। কোন জুতসই মওকার অপেক্ষা করছিল। তাদেরও এ সংশয় প্রস্তুতি সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.almodina.com

ওয়াসাল্লাম ওয়াকেফ ছিলেন যথাযথ। রীতিমত তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য লোক নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার লক্ষ্যে দুইশ' জানবাজ মুজাহিদের একটি স্পেশাল ফোর্সও তৈরি করে রেখেছিলেন।

এদিকে খায়বারে নির্বাসিত ইহুদীরাও তো ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয়। তাই তারা ভবিষ্যত পরিকল্পনাকে সামনে নিয়ে রীতিমত যোগাযোগ বজায় রাখছিল মক্কার কাফেরদের সাথে। তাদেরকে নানাভাবে মদীনার জানবাজ মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করছিল প্রতিনিয়ত। গাদ্দার ইহুদীদের দুই শিবির মদীনার উপকণ্ঠ নিবাসী আর নির্বাসিত খায়বার গোষ্ঠীর অন্দর বাহির ষড়যন্ত্রের মুখে সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকতে হচ্ছিল হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং জাঁনেছার সাহাবায়ে কেরামের বিপ্লবী কাফেলাকে!

খন্দকের যুদ্ধ

খায়বারে নির্বাসিত ইহুদীদের প্ররোচণায় পরাজিত কাফের গোষ্ঠীর মৃত মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে, শত্রুতার ভোঁতা বিশ্বাস শানিত হয়ে ওঠে পুনর্বার। অবশেষে হিজরী পঞ্চম সালে দশ হাজার সশস্ত্র বাহিনীর বিশাল দল পবিত্র মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথাসময়ে সংবাদ পান। সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে পরামর্শে বসেন। প্রিয় নবীজীর বিজ্ঞতম প্রিয় সাহাবী সালমান ফারসী (রা.)-এর পরামর্শে মদীনার চারপাশে পরিখা খনন করে বেঈমানদের মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতিহাসে এই যুদ্ধকে খন্দকের যুদ্ধ নামে স্মরণ করা হয়।

দীর্ঘ বিশ দিন পর্যন্ত পবিত্র মদীনাকে ঘেরাও করে রাখে বেঈমানেরা। এরই মধ্যে একদিন তারা মুসলমানদের উপর পাথর বর্ষণ শুরু করে দেয়। মুসলমানগণ পূর্ণ প্রাণ ও উৎসাহের সাথে মোকাবেলা করতে থাকেন। মুসলমানদেরকে এদিকে ব্যস্ত থাকতে দেখে এই সুযোগে মদীনার মুসলিম নারীগণ যে স্থানটায় অবস্থান করছিলেন বনূ কুরায়যার ইহুদীরা সেখানে হামলা করে বসে। অথচ তাদের জানা ছিল না, তাদের হামলাটা হচ্ছে ঈমানের উপর। হোক না সে ঈমানের ধারক নারী কিংবা বুড়ো। কুফুরীতো ঈমানকে পরাজিত করতে পারে না। তাই হামলা হতেই দীপ্ত প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন বীরাঙ্গনা নারীগণ। শানিত চেতনা, জিহাদী বিশ্বাস, ঈমানী বীর্য আর বিপ্লবী প্রতিরোধের এক ধাক্কায় ইহুদীরা লেজ পিঠে ফেলে ভুঁ ছুট। তারপর ইঁদুর ইহুদীদের কেউ আর ওইদিকে মাথা ওঠাবারও হিম্মত করেনি।

তারপর মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ তাআলার করুণা ও অনুগ্রহের বৃষ্টি

www.almodina.com

হয়েছে। ইহুদী-মুশরিকদের ঐক্যে চিড় ধরেছে। রাতে প্রবল ঝড় ওঠেছে। মুশরিকদের তাবু লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। কনকনে শীতের প্রকোপে পড়ে তাদের পলায়ন ছাড়া আর কোন গতি ছিল না তখন। অতঃপর এভাবেই ঘেরাও কর্মসূচি ভেস্তে গেছে। জ্বলে রয়েছে সত্যে দীপ পূর্ণ উদ্যমে, পূর্ণ স্বকীয়তায়।

যে প্রদীপের রক্ষা প্রাচীর
ক্ষিপ্র ঝড়ের স্বয়ং হাওয়া
সেই প্রদীপ কি নিভতে পারে
জ্বেলেছেন যা আল্লাহ তাআলা।

খন্দক যুদ্ধ থেকে অবসর হওয়ার পর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ কুরায়যার গাদ্দারী ও বেঈমানীর উচিত শিক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে তাদের উপর হামলা করার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পেতেই সাহাবায়ে কেরাম (রা.) প্রস্তুত। বিশেষ করে নারীদের উপর হামলা করায় সাহ-াবীদের মনে প্রতিশোধের অগ্নিশিখা তখন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। সিদ্ধান্ত মাফিক অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মামকতুম (রা.)কে মদীনায় স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ কুরায়যাকে ঘেরাও করেন। দীর্ঘ পঁচিশ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর বাধ্য হয়ে বনূ কুরাইজা আত্মসমর্পণ করে এবং বলে আল্লাহ'র রাসূল যে ফায়সালা দিবেন আমরা তাই মেনে নেব।

তাদের এই আত্মসর্পণের পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেদমতে হাজির হলো বনূ আউসের লোকেরা। তারা আরয করলো, হে রাসূল! বনূ কুরাইজাতো আমাদের হালীফ-সন্ধিবদ্ধ গোত্র। তাই আমাদের অনুরোধ, যেভাবে ইতিপূর্বে আযরাজীদের অনুরোধে বনূ নাযীরের সাথে যেমন আচরণ করেছেন আমাদের অনুরোধ এই বনূ কুরাইজার সাথেও অনুরূপ আচরণ করবেন। এদিকে বনূ কুরাইজার ইহুদীরা হাতিয়ার ফেলে দিয়ে নিবেদন করলেন আমাদের সম্পর্কে বনূ আউসে সরদার 'সা'দইবন মুআয' যে ফয়সালা দিবেন আমরা তা মেনে নেব।

হযরত সাদ ইবন মুআয (রা.)-এর সাথে ইহুদীদের সম্পর্ক দীর্ঘ দিনের। ব্যবসায়িক সম্পর্ক তো ছিলোই। তার উপর বন্ধু কবীলার সরদার বলেও এদের কাছে হযরত সাদ (রা.)-এর গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই ইহুদীরা ভেবেছিল, দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ও তেজারতি সম্পর্কের কারণে হযরত সাদ নিশ্চয়ই তাদের সাথে নরম ব্যবহার করবেন।

সদ্য সমাপ্ত খন্দক যুদ্ধে হযরত সাদ (রা.) মারাত্মকভাবে আহত হন। তাই মসজিদে নববীর পাশেই একটি তাবুতে তিনি অবস্থান করছিলেন। ইহুদীদের

www.almodina.com

গাদ্দারী ও বেঈমানীর কথা শোনে তিনি খুবই আঘাত পান। কিন্তু বনূ আউসের সুপারিশ ও ইহুদীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাদ (রা.)কেই বিচারক নির্ধারণ করেন।

হযরত সাদ (রা.) তখন ইহুদী নেতাদেরকে ডেকে পাঠান। ডেকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের এই সংকটের নিরসন কি পবিত্র কুরআনের আলোকে করব না তোমাদের কিতাব তাওরাতের আলোকে করব? তারা জোর দিয়ে বলতে থাকে, আমাদের বিচার আমাদের গ্রন্থ মতোই করুন। তখন হযরত সাদ ইবন মুআয (রা.) বলেন তোমাদের তাওরাত গ্রন্থের 'ইসতিসনা' নামক অধ্যায়ে আছে।

'যখন তুমি কোন শহরে আক্রমণ করতে যাবে তখন প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব দিবে। যদি তারা প্রস্তাব মেনে নিয়ে দরোজা খুলে দেয় তাহলে সেখানে অবস্থানরত সকলেই তোমার দাস-দাসী হয়ে যাবে। আর যদি সন্ধি করতে নারাজ হয় তাহলে তাদেরকে অবরোধ করবে। তারপর তোমার প্রভু যখন তাদেরকে তোমার নিয়ন্ত্রণে এনে দিবেন তখন উপস্থিত সকল পুরুষকে হত্যা করে ফেলবে এবং বয়স্ক পুরুষ ব্যতীত শিশু নারী জানোয়ার ইত্যাদি যা অবশিষ্ট থাকবে তার সবগুলোই তোমার জন্যে গনীমত- যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হবে।'

তাওরাতের এই বিধান মাফিক হযরত সাদ (রা.) স্বীয় সিদ্ধান্তের কথা সকলকে শুনিয়ে দেন। বলে দেন, ইহুদীদের মধ্যে যুদ্ধ করতে সক্ষম এমন সব পুরুষকে হত্যা করে ফেলা হবে। আর শিশু এবং নারী হবে বন্দী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাদ (রা.)-এর ফয়সালাকে অনুমোদন করেন। হযরত সাদ (রা.) এর ফয়সালা মুতাবিক ছয় শত ইহুদীকে হত্যা করা হয়। অবশ্য হযরত সাদ (রা.) এই রায় প্রদান করার পরের দিনই শাহাদত বরণ করেন।

খায়বারের ইহুদী গোষ্ঠী

বনূ কুরায়যার পর পবিত্র মদীনা শহর পরিপূর্ণভাবে ইহুদী মুক্ত হয়ে ওঠে। ইহুদীদের শিবির এখন খায়বারে। অবশ্য খন্দক যুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের নিষ্ফলা প্রস্থান অতঃপর বনূ কুরায়যার নিঃশব্দ পতন তাদের হৃদয়ের দ্বেষ ক্রোধ ক্ষোভ হিংসার জাহান্নামকে বহুগুণে তাপিত করে তোলে। তারা তখন কঠিন ভাবনায় পড়ে যায়। অবশ্য খায়বারে তাদের অবস্থান ছিল নিরাপদ এবং পোক্ত। কয়েকটি কেল্লায় বিভক্ত নিবাস। মদীনা থেকে প্রায় দুইশ' মাইল দূরে অবস্থিত।

তারা ভাবল অন্য কথা। অন্য কোন কৌশলে মক্কার পরাজিত মুশরিকদের পুনরায় ক্ষেপিয়ে তোলা যায় কিনা- সে কথা ভাবল তারা। এও ভাবল, তাদের হাতে এখন বিত্তও আছে। বিত্তের লোভ দেখিয়েও আরেকটি চূড়ান্ত লড়াই

www.almodina.com

বাধানো যায় কিনা। এই মতলবে তারা বনূ গিতফানের চার হাজার যুবককে এই শর্তে রাজী করল, তারা মদীনার মুসলমানদের উপর হামলা করবে। বিনিময়ে মদীনা বিজয়ের পর তাদেরকে খায়বারের অর্ধেক ফসল দিয়ে দিবে। সুতরাং এই বিশাল সংখ্যক সৈন্য সাহায্য পেলে মক্কার রণক্লান্ত পরাজিত অনুতপ্ত বেদনাহত বিক্ষুব্ধ নেতারাও পুনরায় নেমে আসবে 'লাত লাত' বলে। এই ছিল তাদের খাব!

চারদিকে প্রস্তুতির ডামাঢোল বাজছে। রাহমতের নবী, যুদ্ধের নবী, শান্তির নবী সবই শোনলেন। জানলেন সন্তর্পণে সব সংবাদ। ইলাহী চিন্তা ও নববী দর্শনের আলোকিত বিবেচনায় এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিলেন। হিজরী ষষ্ঠ সালে হুদায়বিয়া নামক স্থানে মক্কার মুশরিকদের সাথে একটি শক্তিশালী পরিচ্ছন্ন শান্তি চুক্তি করে বসলেন। চুক্তি সম্পাদনের পর মদীনায় এসে যিলহজ মাসের অবশিষ্ট কাল এবং মরহরমের কয়েকদিন কাটালেন নীরবে। তারপর বনূ গিতফানের যুবকদের সঙ্গে করে মদীনা অভিমুখে ইহুদীদের যুদ্ধ যাত্রার পূর্বেই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

যারা হুদায়বিয়ায় শরীক ছিলেন তাঁরাই এখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গীযোদ্ধা। পতাকা হযরত আলী মুরতাযার হাতে। হযরত আইশা (রা.)-এর ওড়না দ্বারা তৈরি হয়েছিল এই পতাকা। এই সফরে অন্তত বিশজন মহিলা সাহাবীও ছিলেন আহতদের সেবা ও চিকিৎসার জন্য। ইহুদীরাও পূর্ব থেকেই সতর্ক ছিল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন বার্তা শোনতেই কেল্লার হেফাযতি ব্যবস্থাসহ যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যায়।

খায়বারে ইহুদীদের মোট সাতটি কেল্লা ছিল। কিন্তু প্রথম কেল্লা 'নায়েম'কে যখন মুসলমানগণ জয় করে ফেলেন তখন তারা তুলনামূলক শক্ত ঘাঁটি 'কামূস'-এ গিয়ে একত্রিত হয়। মুসলমানদের সৈন্যদলের প্রথম বাহিনীর নেতৃত্ব দেন হযরত আলীর হাতে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্যে সাফল্যের দুআ করেন। হযরত আলী মহাবীর্যে এগিয়ে যান এবং ইহুদীদের বিখ্যাত পাহলোয়ান মারহাবকে হত্যা করে ফেলেন। এতে করে বেলুনের হাওয়া ছুটে যাওয়ার মত ইহুদীরাও অনেকটা চুপসে যায়। অতঃপর সরলছন্দ গতিতে একের পর এক সবকটি কেল্লা মুসলমানগণ জয় করেন।

পতনের পর ইহুদীরা এসে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে নিবেদন করে, আমাদেরকে খায়বারেই থাকতে দিন। আমরা এর বিনিময়ে খায়বারের জমি জমা চাষ করে এর অর্ধেক ফসল মুসলমানদেরকে দেব। রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরাজিত অসহায় এই চিরধূর্তদের আর্জি আবারও রক্ষা করেন এবং তাদেরকে খায়বারেই থাকতে দেন।

www.almodina.com

অতীতের সকল গাদ্দারী ভয়ংকর শত্রুতার কথা ভুলে যান। শান্তিপূর্ণ নিরাপদ পরিবেশে বাঁচার সুযোগ পায় পাপীষ্ট ইহুদীরা। সেই সাথে এতবড় অনুগ্রহের কথা ভুলে গিয়ে ডুবে যায় পূর্ব খাসলতে- ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত আর ঘুঁটি চালাচালিতে।

নষ্ট ইহুদী : শেষ ষড়যন্ত্র

কেল্লা ফতেহ। পদানত ইহুদীরা। মদীনায় ফেরার জন্যে প্রস্তুত আল্লাহর রাসূল। ঠিক এমন সময় নিহত পালোয়ান মারহাব-এর ভাবী, সালাম-ইবন মুশাক্কাম-এ স্ত্রী যায়নাব বিনতুল হারস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার কয়েকজন সাহাবীকে দাওয়াত করলো! খানার জন্যে একটি দুম্বা জবাই করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, হে রাসূল! আপনি দুম্বার কোন অংশটা বেশি পছন্দ করেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- বাহুর গোশত আমার অধিক পছন্দ। একথা শোনে ইহুদী যায়নাব করলো কি, পুরো গোশতেই বিষ মিশ্রিত করলো। তবে সবিশেষ গুরুত্বসহ বিষ মিশালো দুম্বার সামনের দুটি রানে। যে অংশটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দ! খানা খেতে বসে গোশতে কামড় দিয়ে গেলার পূর্বেই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন : 'এই হাড় আমাকে বলছে, এর সাথে বিষ মেশানো হয়েছে। কিন্তু তার আগেই সাহাবী বিশর ইবন বারা (রা.) একগ্রাস গিলে ফেলেছিলেন এবং বিষক্রিয়ায় শাহাদত বরণ করেন।

জীবন সায়াহ্নে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লে এই ঘটনার কথা স্মরণ করে বলেন, আমার কাছে বিশর-এর মা এসেছিল। আমি তাকে বলেছি, খায়বারে আমি যে গোশতে কামড় দিয়েছিলাম সে কারণে এখনো প্রচন্ড ব্যথা অনুভূত হচ্ছে। আর এই গোশত খেয়েই তোমার ভাই বিশর শহীদ হয়েছে। এই বর্ণনা মতে এই বিষক্রিয়ার যন্ত্রণাই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের কারণ।

সারকথা, ইহুদীরা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় ইসলাম, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলিম মিল্লাতকে নিঃশেষ করার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রের যে জাল রচনা করতে শুরু করেছিল তা আর কোন দিন বন্ধ হয়নি। বন্ধ হয়নি আজো তবে বিষয়টি মনে রাখি না কেবল আমরা।

www.almodina.com

সমাজ সংস্কার : নববী পদ্ধতি

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ থেকে আলাদা হয়ে বাঁচতে পারে না মানুষ এবং একথাও সত্য, এই মানুষকে নিয়েই সমাজ। বরং এই মানুষের এক একটি সদস্য আমাদের সমাজ সংসারের এক একটি ভিত্তি, এক একটি অঙ্গ। তাই একটি সুস্থ, নিরাপদ ও সুন্দর সমাজের কথা ভাবতে গেলেই ভাবতে হয় মানুষের কথা। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির কথা। প্রতিটি ব্যক্তিসত্তার সুস্থতা ও পরিশুদ্ধিতার কথা। একটি শক্তিশালী মজবুত অট্টালিকা তৈরি করতে হলে যেভাবে তার গাত্রে ব্যবহৃত প্রতিটি ইট সুরকি মজবুত হতে হয়, খাঁটি ও মানসম্পন্ন হতে হয় সিমেন্টের প্রতিটা কণা, ব্যবহৃত সকল মাল-মশলা। অনুরূপ একটি শান্তিময় সুস্থ ও সোনার সমাজ নির্মাণের জন্যেও চাই প্রতিটি নাগরিকের, সমাজের প্রতিটি সদস্যের সুস্থতা, চারিত্রিক উৎকর্ষতা। দুর্বল ইটের তৈরি অট্টালিকা যেভাবে মজবুত হতে পারে না- যে সমাজের সদস্যগণ অসুস্থ সে সমাজও কোনদিন সুস্থ ও সুন্দর হতে পারে না।

বলা বাহুল্য, মানুষ যে সমাজে বাস করে সে সমাজ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আরো অগণন সৃষ্টি। গাছ-পালা, তরু-লতা, পশু-পাখি থেকে শুরু করে এই অধুনা যুগের কত বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি অবিরাম শোভা বর্ধন করে চলেছে এই সমাজ সংসারের। অথচ বিবেকবান মাত্রই জানেন, এর কোনটিই সমাজের মৌল অঙ্গ নয়। ব্যবহৃত আসবাব পত্র মাত্র। ভালো-মন্দ, উন্নতি-অবনতি কোন ক্ষেত্রেই এগুলোর স্বাধীন ভূমিকা নেই। মানুষের আজ্ঞাবহ হিসেবে আমরণ সেবা নিবেদনই এগুলোর ধর্ম। সুতরাং সমাজ সভ্যতার প্রকৃত চাবি-কাঠি হিসেবে এগুলোকে সক্রিয় ধারণা করার অবকাশ নেই যুক্তি নেই।

আর একারণেই পৃথিবীর সকল ভালো মন্দ বিবেচিত হয় এই মানুষকে কেন্দ্র করে। পৃথিবীর যে সময়টি কেটেছে সুস্থ সুন্দর মানব মানবীর স্পর্শে মহকালের ইতিহাসে ওটাই পৃথিবীর সোনালী যুগ। আবার সেই একই ধরনী সময়ের ব্যবধানে বসবাসকারী মানব-মানবীর উচ্ছৃংখলতার আঘাতে আখ্যা পেয়েছে বর্বর কালের, মূর্খযুগের। পরবর্তী প্রজন্ম অযুত লক্ষ ঘৃণার সাথে

www.almodina.com

স্মরণ করে সে যুগকে, সে সময়কার পৃথিবীকে।

স্থান-কাল পাত্রের এই মানগত ব্যবধানকে আমরা আরো কাছে থেকে দেখতে পারি। এইভাবে অনেকগুলো পরিবার নিয়ে গড়ে ওঠে একটি নাতিবিস্তৃত জনবসতি। সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে গ্রাম বা মহল্লা বলি আমরা। আমরা প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করি, এই গ্রাম ও মহল্লার প্রতিটি পরিবারকে একই নজরে দেখে না মানুষ। বরং কোন পরিবারকে ভালো জানে আবার কোন পরিবারকে জানে মন্দ। এই ভালো মন্দের ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয় সেই পরিবারের সদস্যদের চারিত্রিক গুণাবলীকে। যে কারণে প্রচুর ধনভান্ডারের মালিক হয়েও তাচ্ছিল্যের শিকার হচ্ছে একজন আবার প্রচন্ড দারিদ্রে পিষ্ট আরেকজন হচ্ছে সকলের কাছে পরম সমাদরে নন্দিত। অভ্রস্পর্শী অট্টালিকার মালিক ধনকুবের কুড়াচ্ছে শত গ্লানি শত ধিক্কার আর কুড়ে ঘরে বসে কতজন জয় করে চলছে মানুষের হৃদয়রাজ্য। এ সত্য প্রাগৈতিহাসিক। এ বাস্তবতা অকাট্য। সকল যুগে সকল দেশে সমানভাবে সমাদৃত এ দর্শন। হতে পারে অর্থ কিংবা পেশীর বলে কাউকে পরাজিত করা যায়, নতিস্বীকার করানো যায়, কুখ্যাতি আনা যায় কিন্তু শ্রদ্ধাভরে স্মরিত হওয়া যায় না। কারণ, শ্রদ্ধা সম্মান নিরাপত্তা ও সুস্থতার ভিত্তি চরিত্র। পার্থিবতার কোন দখলদারী নেই এতে।

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আগমন করলেন, তখন এই শাশ্বত, চিরন্তন সভ্যতা ছিল পেশীশক্তি, অর্থ-দর্প আর বংশীয় মেকী গৌরবের প্রবল আতংকে ম্রিয়মাণ। চারিত্রিক গুণাবলীর প্রতিটি প্রদীপ তখন নিষ্প্রভপ্রায়। সর্বত্রই বস্তুবাদের ঝড়। প্রভু মনিবের আসনও দখল করে বসেছে এই বস্তুবাদ। বস্তুবাদের সেই প্রচন্ড উত্তাপে দহিত সমাজ যেন বসবাসের অনুপযোগী। সেখানে শান্তি নেই, নিরাপত্তা নেই, সুস্থতা নেই। সেখানকার অধিবাসীরা ওসব বুঝেও না তখন।

নবীজী ভাবলেন। সেই পংকিল গলি অস্বস্তিকর সমাজটাকে ভালো করার কথা ভাবলেন। সমগ্র পৃথিবীটাকে সুন্দর করে মনের মত করে ঢেলে সাজাবার কথা ভাবলেন এবং তার উপযুক্ত ব্যবস্থাই তিনি করলেন।

প্রিয়নবীজী প্রাণ খুলে দেখলেন, সকল সমস্যার উৎসতো হলো এখানকার মানুষগুলো এই সমাজের সদস্যগুলো। এদেরকে ঠিক করা গেলেই সব ঝামেলা চুকে যাবে এবং এ লক্ষ্য নিয়েই তিনি ময়দানে অবতরণ করলেন। সারা পৃথিবী যখন বস্তুতান্ত্রিক বিজয়ের পেছনে হন্যে হয়ে ছুটছে, রুম পারস্য

www.almodina.com

দুই পরাশক্তি যখন সমগ্র দুনিয়া জয়ের নেশায় মাতাল হয়ে ওঠেছে, তাদের বিজয়ের ত্রাসে যখন কাঁপছে সমকালীন পৃথিবী তখন নবীজী বসে আছেন মদীনায়। নীরব শান্ত মৌনকান্তি ঘিরে তাঁর বসে আছেন গুটি কতেক মুসলমান। সকলেই নবদীক্ষিত। তিনি তাঁদেরকে নিয়ে বসে আছেন। আর পড়াচ্ছেন এক আল্লাহর কথা। সভ্যতার কথা। সুন্দর চরিত্র মাধুরির কথা। গুরুগম্ভীর কন্ঠে তিনি উচ্চারণ করছেন 'উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের লক্ষ্যেই আমার আবির্ভাব।।'

অথচ তখন তাঁর সামনে এই পারস্য। ঐ রোমকদের সদর্পী অস্তিত্ব তাঁর চোখের বলয়ে। এই দুই পরাশক্তিকে পদদলিত করে চির সত্যের বিজয় কেতন উড়াতে হবে ওখানে একথাও তিনি জানতেন। তাঁর পরমপ্রিয় মাওলা সকল জ্ঞানের আধার তাকে বহু আগেই ওসব কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তাই বস্তুবাদী ব্যাখ্যাতো এটাই ছিল, ঐ দুই পরাশক্তিকে পরাজিত করার জন্যে, অধিকন্তু পশ্চাতে ফেলে আসা মক্কার কাবাঘরকে আযাদ করার জন্যে তিনি প্রস্তুতি নিবেন। ট্রেনিং দিয়ে অস্ত্র অর্থে বর্ণাঢ্য করে তোলবেন তার মুসলিম বাহিনীকে। কিন্তু এমন দেখা গেল না। দেখা গেল এর উল্টো।

দেখা গেল, তিনি তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে বসে আছেন মসজিদে। তার সে মজলিসকে ছেয়ে আছে ভারি রহমত, গভীর নীরবতা, অপরিসীম শ্রদ্ধা, সীমাহীন ভ্রাতৃত্ববোধ, অপার আন্তরিকতা। আর তিনি তাদেরকে শেখাচ্ছেন এই পার্থিব জগতটার মূল্য মাছির একটি পাখনার সম্মানও নয়। তিনি ছোটদেরকে স্নেহ আর বড়দেরকে শ্রদ্ধা করতে বলছেন। অন্যের অধিকার বিনষ্ট করা মহা অপরাধ। অন্যের উপকার করাই বরং সার্থকতা। তিনি আরও বলছেন, দীন শেখার গুরুত্বের কথা। বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ, নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহ কামনার কথা। সুন্দর-কল্যাণময় গুণাবলীর আলোকে জীবন গড়ার কথা তিনি বলছেন। কেননা, তিনি জানতেন, অস্ত্র, ক্ষমতা কিংবা অর্থের দ্বারা পৃথিবীর অনেক কিছু দলিত করা গেলেও হৃদয় জয় করা যায় না। পৃথিবীর সকল কিছু এর দ্বারা অর্জিত হলেও শান্তি, নিরাপত্তা ও সুস্থতা আনয়ন করা যায় না। বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় অশান্তি। প্রতিনিয়ত বয়ে চলে জয়-পরাজয়ের কাকতালীয় খেলা। কে কাকে কুপোকাত করবে এই নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা। ফলে মানুষের সমাজ রূপান্তরিত হয় পশুর সমাজে। যেখানে নেই কোন জীবনের মূল্য। ক্ষমতার মূল্য কি ছার?

নবীজী সেই পরাশক্তির দিকে তাকালেন। গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন

www.almodina.com

সেখানকার দৈন্যের কথা। তিনি দেখলেন, ওরা বড় অসহায়। পার্থিব সামান্য ক্ষমতা কিংবা একটু জৌলুসপূর্ণ জীবনের আকাঙ্খায় কিভাবে অবলীলায় চালায় মানব হত্যা। বসতির পর বসতি উজাড় করে ফেলে। আর সেই রক্ত থেকেই বেরিয়ে আসে প্রতিবাদের কণ্ঠ। ফলে তাদের জীবনও হয় চরম সংঘাতপূর্ণ, যাতনা বিক্ষুব্ধ। ওদের হাতে অনেক কিছুই আছে। নেই শুধু মানুষের মত বাঁচবার শক্তি। নিরাপদে স্বস্তিতে একটি শ্বাস ফেলবার সুযোগ ও সৌভাগ্য তাদের নেই। একটি বন্যপশুও গভীর রজনীতে নিজেকে নিরাপদ ভাবে কিন্তু ওরা ভাবতে পারে না। ওদের চরিত্রে কৃত অপরাধ জন্ম দিয়েছে সীমাহীন জুজুবুড়ির ভয়। সেই ভয়ে ওরা সর্বদাই প্রকম্পিত।

নবীজী পুরো পৃথিবীটাকে সেই ভয় থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখাতে চাইলেন। তিনি অন্যের প্রতি ভয়, জীবনের প্রতি অনাস্থা ও অন্যের জীবন ভারি করে তোলার মত সকল অপরাধ উৎসগুলো চিহ্নিত করলেন এবং এও চিহ্নিত করলেন, সমাজ নয়, সমাজের অধিবাসীদেরকে এসব দোষ থেকে মুক্ত করতে পারলেই এই রক্তাক্ত পশুসমাজ হবে কুসুমাস্তীর্ণ মানুষের সমাজ। আর তার জন্যে চাই একটি নমুনা। উজ্জ্বল একটি উদাহরণ। সেই উদাহরণ সৃষ্টিতে মশগুল হলেন তিনি।

তিনি কিছু লোককে সুস্থ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই মসজিদে নববীতে একটি শিক্ষালয় গড়ে তোললেন। নবীজির মাদরাসা সেটা। সেখানে বসে তালিম নিতে লাগলেন আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, আবু যার গিফারী ও সালমান ফারসীসহ নবীজির সকল সাহাবী। আগামী পৃথিবীর উপমায় শাসকগণ। ব্যবসা কিংবা কৃষি ব্যস্ততায় যারা বেশি বেফুরসত তারাও সময় করে কিছু সময় কাটাতে লাগলেন সেখানে। নবীজির কাছে তারা শোনেন, কিভাবে জীবন যাপন করতে হয়। অন্যের সাথে কিভাবে আচরণ করতে হয়। বড় ছোট, প্রভু-ভৃত্য, মালিক-চাকর, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, শাসক-শাসিত কার সাথে কার আচরণ কেমন হবে তা তারা শোনেন এবং সে মুহূর্তেই তা আমল করতে শরু করেন নিজেদের বাস্তব জীবনে। এভাবেই তরতরিয়ে বদলে যায় মদীনার সমাজ। এক সময় দেখা যায় চুরির প্রতিও তাঁদের চরিত্রে ঘৃণা জেগেছে। তাই কেউ চুরি করে না। রাস্তায় গভীর অন্ধকারে মণি মুক্তা পড়ে থাকলেও না। অন্যের রমণীর প্রতি তাকানো কু-স্বভাবের কাজ। তাই তাঁরা সেদিকে তাকায় না। চরিত্রের তাগিদে। ছোটকে স্নেহ করে, বড়কে শ্রদ্ধা করে, দুবর্লকে সাহায্য করে। চরিত্রের আকর্ষণে করে। পার্থিব কোন প্রলোভনে নয়।

www.almodina.com

মদ্য-নেশায় অভ্যস্ত আরব্য সমাজ। মদ পান করে। মদের ব্যবসা করে। নিয়মিত আড্ডাখানার প্রাণিকাশক্তিই মদ। কিন্তু যেই শুনেছে এতে উপকারের চাইতে ক্ষতি বেশি। ঘৃণা জেগেছে এর প্রতি। আবার ক'দিন না যেতেই যখন শোনেছে নবীজী মদ পান করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, ওটা পান করলে ভালো-মন্দের বিচার থাকে না। অমনিই চকিত হয়েছে সকলে। পানকারী ছুঁড়ে মেরেছে পানপাত্র। ব্যবসায়ী মদের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে গলি পথ। পাহাড়ের চূড়ায় মদ বোঝাই কাফেলা নিয়ে পৌঁছতেই যখন শুনেছে এ খবর, এক কদম অগ্রসর হয়নি। চাকর পাঠিয়ে খবর নিয়েছে ঘটনা সত্য কি না। সত্য বলে সংবাদ পেতেই মদ্য বোঝাই সকল মটকা পাহাড় থেকে তলদেশে ছেড়ে দিয়েছে। পাহাড় স্নাত হয়েছে শরাবে শরাবে। নিঃস্ব হয়েছে ব্যবসায়ী। তবুও দুঃখ নেই। কারণ, ওই মদপানে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। সমাজ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

মোদ্দাকথা, নবীজী তাঁর জীবনের সবটুকুন সামর্থ্যের বিনিময়ে একদল সুস্থ মানুষ গড়ে তুলেছিলেন। যার ফলে তারা যখনই জানতে পেরেছেন কোন বিষয়কে মন্দ বলে অমনিই তা বর্জন করেছেন। এর জন্যে নোটিশের প্রয়োজন হয়নি। আর ভালো কিছু শোনার পর প্রতিযোগিতা হয়েছে তা অর্জনের। ফলে ভালোয় ভালোয় ভরে ওঠেছে মদীনার সমাজ। শত্রু মিত্র সকলেই আজ যে সমাজের প্রশংসা করে। ইতিহাস যে যুগটার নাম রেখেছে স্বর্ণযুগ; যে সমাজটার নাম দিয়েছে সোনার সমাজ। আর সে সমাজের মানুষগুলোকে আখ্যা দিয়েছে সোনালী মানুষ বলে।

বিংশ শতাব্দীর এই শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আজ আমরা যদি ভাবি আমাদের সমাজের কথা, মিলিয়ে যদি দেখতে চাই আজকের যুগটাকে সেই সোনালী যুগটার সাথে, আর নিরপেক্ষ ও সুস্থমনে যদি মন্তব্য করতে চাই, তাহলে অবশ্যই বলতে হবে পার্থিব ধন-দৌলতে, আবিষ্কার ও রহস্য উদ্ধারে আমরা সেই চৌদ্দশ' বছর আগেকার পাতাল ছেড়ে এখন আকাশে ওঠে বসেছি। আর যদি বলতে চাই সুখ শান্তি, হৃদ্যতা, আন্তরিকতা, পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ততা, আস্থা, জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা এক কথায় মানব জীবনের সুস্থতার কথা তাহলে বলতে হবে আমরা এখন যাপন করছি এক মানবেতর ঘৃণিত পশুজীবন। এখানে জীবনের নিশ্চয়তা নেই, ভালোর মুল্য নেই, নেই কোথাও সততা, সুস্থতা।

বলতে দ্বিধা নেই, যে অসভ্যতা, পাশবিকতা বিদূরণে নবীজী মাদরাসা চালু

www.almodina.com

করেছিলেন, বিদ্যালয় খুলে ছিলেন আজ সে বিদ্যালয়েই শিক্ষা দেয়া হচ্ছে এসব পাশবিকতা। যাদের ছোঁয়ায় সমাজের সকল সদস্যরা সুস্থ হয়ে ওঠবে তাদের শিক্ষায়ই আজ সুস্থতা নেই। ওরা চুরির গল্প পড়ে, ব্যভিচারী, অত্যাচারীদের জীবনী পড়ে, সুদ-ঘুষের অংক শিখে, শিখে নর্তন-কুর্দনের গুরুত্ব। শিখে সুযোগ বুঝে অন্যের ক্ষমতা দখলের পলিসি। শিখে নারী-পুরুষের অবাধ বন্ধুত্বের রোমাঞ্চকর গল্প-কবিতা। তারা তাদের গুরুদের মধ্যে পবিত্রতার আলো দেখে না। দেখে ফাঁকিবাজি ও ফটকাবাজির আর্ট। এভাবেই গড়ে ওঠে। আরও একটু সামনে গিয়ে উচ্চ শিক্ষার নিকেতনগুলোতে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেয় দস্যিপনার, খুন-খারাবির। গুরুকে লাঞ্ছিত করার, বন্ধুকে হত্যা করার, মা-বোনকে সম্ভ্রমহানি করার (অবশ্য ভিন্ন নামে)। বাস্তবে প্র্যাক্টিস করার সুযোগ পায় ওরা এখানে। অবশিষ্ট পাশবিকতার যা থাকে তা শিখার জন্যে খোলা হয়েছে টিভি, জিটিভিসহ আরো কত রাঙা পথ। যার এক একটি স্পর্শে মানবতার এক একটি চরিত্রের অতর্কিত মৃত্যু হয়। ক্রমে প্রতিটি নাগরিক হয়ে পড়ে মানবতা শূন্য এক প্রাণী বিশেষ। আর সেই সমাজকে সুস্থ করার জন্যে তৈরি করা হয় নতুন নতুন আইন। সংশোধনী আনা হয় রাষ্ট্রীয় সংবিধানে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

কারণ স্পষ্ট। আইনতো শুদ্ধ। কিন্তু ওই আইনতো সশরীরী কোন অস্তিত্ব নয়। আপন বলে সে কোনরূপ বিকাশ করতেও পারে না। তাকেতো বিকশিত হতে হয় অন্যের আশ্রয়ে। আর সেতো হলো রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক। প্রতিটি সদস্য। যতদিন পর্যন্ত ওই নাগরিকগণ সেই আইন গ্রহণ করার, আইনের আলোয় জীবন গড়ার চরিত্র লাভে সক্ষম না হবে ততদিন পর্যন্ত ওই আইনে যে কোন সফলতা আসবে না তাতো আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট। সুতরাং যে পথে সুস্থতা এসেছিল নবীজী প্রদর্শিত পরীক্ষিত সেই পথেই অগ্রসর হওয়াটা বুদ্ধিমানের পরিচয় নয় কি? জানি না আমাদের সুবুদ্ধির উদয় হবে কি-না!!

www.almodina.com

রবিউল আউয়াল : মুমিনের চেতনায়

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনের একান্ত আপন। সকল মুমিনের। কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য সকল মুমিনের মুক্তির জন্যেই আগমন হয়েছিল তাঁর। বরং তিনি রহমত হয়ে এসেছিলেন নিখিল জাহানের। পৃথিবীর সকল মানুষের নাজাতের পথ রচনা করতেই তিনি উৎসর্গ করেছেন তার সকল প্রয়াস। 'তারা যদি এই বাণী মেনে না নেয় তাহলে কি তাদের পেছনে পড়ে আপনি আপনাকে ধ্বংস করে দিবেন'-এর মত ইলাহী ইতাব-ভৎর্সনা নাযিল হওয়ার পরও থেমে যাননি তিনি। সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্যে তিনি কেঁদেছেন। তিনি কেঁদেছেন কিয়ামত অবধি আগতব্য সকল উম্মাতির নাজাতের জন্যে, সফলতার জন্যে, উভয় জাহানের শান্তির জন্যে।

পৃথিবীতে মানুষ জন্মে। মানুষকে ঘিরেই এখানকার সকল সৌন্দর্যের সমাহ-ার, সকল রঙ্গলীলার বৈচিত্র। মানুষে মানুষে ভালোবাসা এই পৃথিবীর প্রাণিকা শক্তি। শান্তি ও নিরাপত্তার চালিকাগুণ এটা। যে মানুষের ভেতর মমতা নেই তাকে নিষ্ঠুর বলে, পাথুরে দিল বলে, বলে হৃদয়হীন। এ যেন তাকে কৌশলে সন্ত র্পণে মানুষ না বলারই কসরত।

মা তার সন্তানকে ভালোবাসেন সর্বাধিক। বাবার চাইতেও বেশি। এ কারণেই বোধহয় 'মা নাই গৃহে যার সংসার অরণ্য তার'- এর মত কঠিন প্রবাদ পর্যন্ত সৃষ্টি করেছে মানুষ। মানুষ তার হৃদয়ের সবগুলো কপাট খুলে দিয়ে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে মাকে, মায়ের স্নেহ-মমতাকে। তার জীবনের সকল অঙ্গনেই পেতে চায় সে মায়ের দরদ ও নিখাদ সোহাগ। তাই মায়ের এ ভালোবাসা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্যের দীঘল সবুজ কত মাঠ কত প্রান্তর। কাব্যে গল্পে বারবার উচ্চকিত হয়েছে এ নাম। এক্ষেত্রে বরং মানুষ তুলনা মানতেও নারাজ। মায়ের ভালোবাসাকে সে অপূর্বভাবে, ভাবে অনুপম।

অথচ আমরা দেখি, সন্তানের আঘাতে আহত জননী দু'হাত তুলে নালিশ করে মাওলার দরবারে। তার বিচার চায়, শাস্তি চায়, ধ্বংসও চায় কখনো কখনো। মায়ের যত্নে ত্রুটি করলেও মা নারাজ হন। ভাতে মাছে না পোষতে পারলে বাঙালী জননীরা স্ফটিকস্বচ্ছ সতেজ হাসিটি উপহার দিতে চান না তার আদরের

www.almodina.com

দুলালকে। অধিকন্তু কবে কে কোথায় দেখেছে তার জননীকে তার নন্দন নন্দিনীর ঔরষে আগতব্য প্রজন্মের জন্যে দোয়া মাগতে। কোথায় কোন জননী কবে কেঁদেছেন রাতের পর রাত তার অনাগত দুলাল-দুলালী, নাতি-নাতনীর জন্যে। তাদের কল্যাণ ও সফলতার জন্যে এর দৃষ্টান্ত শুধু বিরলই নয়, ইতিহাসে বরং খুঁজতে মানা। সন্তানের আঘাতে শোণিতাক্ত জননী খুনমাখা হাত তুলে বলেছে- 'আল্লাহ ওকে মাফ করে দাও' এমন চিত্র দেখার সৌভাগ্য বোধ হয় মহাকালের হয়নি আজো। হলে সে বলে দিত। শুনেছি 'ইতিহাস কথা কয়'। কিন্তু কই, একথাতো বলেনি আজো!

অথচ আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ইতিহাস বলেছে অনেক কিছু। তিনি তায়েফে অপন রোধির বহমান স্রোতে কাতরাচ্ছেন আর বলছেন- হে আল্লাহ, মাফ করে দাও। ওরা বুঝেনি। বর্শাবিদ্ধ নবী ওহুদের মাঠেও কেঁদেছেন সেই উম্মতী বলেই। রাতের গভীরে নিস্তব্ধ রজনীর গাম্ভীর্য টুটেছে তাঁর কান্নায়। তিনি তখনও কেঁদেছেন এই অসহায় উম্মতীর কল্যাণার্থে। বিদায় হজে আরাফার মাঠ কেঁপে ওঠেছে তাঁর কান্নায়। সে কান্না ছিল না দেখা না চেনা অনাগত উম্মতের তরে। তবুও কি বুঝতে অসুবিধা হবে, নবীজী আমাদের কত আপন। মায়ের চাইতেও যে তিনি আপন! 'মা' বিরক্ত হন, তিনি হননি। আঘাত পেয়েও না। মা তার পাওনা না পেলে ব্যথিত হন তিনিতো রক্তাক্ত হয়েও রাগ ধরেননি। কারণ, তিনি সকল মানুষের সর্বাধিক আপন। সমগ্র সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়া (আল্লাহ ছাড়া) সকল সত্তার ঊর্ধ্বে।

সুতরাং এ মহান একান্তজন যেদিন পৃথিবীতে এসেছিলেন সেদিন, সে ক্ষণ ও মাসটি কি সকল সময়ের চাইতে আলাদা সুষমায় ভাস্বরিত হবে না? নিশ্চয়ই হবে। তাইতো রবিউল আউয়াল, বার তারিখ, সোমবার আর রাঙা প্রভাতের এত কদর সেই নবীজীর এতিম উম্মতের হৃদয়ে। ভিন্ন পুলকে ভিন্ন আমেজে এন্তেজার করে সে কাঙ্খিত এই রবিউল আউয়ালের।

কিন্তু তার সে সাধ যে দাঁড়াতে পারে না খুশির অলিন্দে। আনন্দের উষ্ণ গাঢ় আলিঙ্গনে বলীয়ান হয়ে ওঠতে পারে না যে আর। কারণ, ওই রবিউল আউয়াল ওই বার তারিখ ওই সোমবারই সাক্ষী হয়ে আছে তার প্রিয়তমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ বিকেলের। ওই দিনেই তার প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে গেছেন আপন মাওলার সান্নিধ্যে। সর্বাধিক আপনজনের ব্যথাতুর স্মৃতি হয়ে বেঁচে আছে এই রবিউল আউয়াল তার ধ্যানের আকাশে। সে ভুলতে পারে না এ স্মৃতি।

তাই রবিউল আউয়ালের ধনুকী হেলাল তার চোখে একটি বাঁকা চাঁদমাত্র নয়।

www.almodina.com

পশ্চিমাকাশে জেগে ওঠা একফালি আনন্দের শশী নয় এটা। এটা তার দৃষ্টিতে একটি প্রচন্ড প্রশ্নের ভয়াবহ চিহ্ন এঁকে দেয়। তার বিবেক বুদ্ধিতে প্রচন্ড আঘাত হানে, আঘাত হানে তার সচকিত অনুভবে। কিভাবে আমন্ত্রণ জানাবে সে এই রবিউল আউয়ালকে! সুখে না শোকে!? কায়দা মাফিক সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব হলে তো শোকই প্রাধান্য পাবার কথা। তাহলে সে কোন মুখে তার প্রিয়তম রাসূলের 'জন্মোৎসব' ঈদ-ই-মিলাদ পালন করবে? এ যেন সেই একমাত্র নন্দনের মুসলমানী উৎসবে প্লাবিত আনন্দের পুলকঘন মুহূর্তে পিতৃবিয়োগের কঠিন দুঃস-ংবাদের মতোই অতি কঠিন মনে হয় মুমিনের কাছে। তার হৃদয়ে সদ্য উম্মিলিত স্বপ্নের বিহঙ্গগুলো ডানা ছেড়ে দেয়। বেদনায় ভেঙে পড়ে। উড়তে পারে না আর। তখন সে ভাবতে শুরু করে- নতুন ভাবনা।

সে ভাবে! এই রবিউল আউয়ালকে বরণ করার কথা ভাবে। তখন তাকে সাহয্য করে ওহীর অম্লান পথ নির্দেশ। আল কুরআনের অনির্বায শিখা। কুরআন বলে দেয় তাকে 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন রাসূলমাত্র। তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল চলে গেছেন। তিনি যদি মারা যান কিংবা শহীদ হন তবে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে তবে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ আল্লাহ তাদেরকে প্রতিদান দেবেন। [আল-ইমরান : ১৪৪]

এ আয়াত তাকে পরিষ্কার বলে দেয়, প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য নবী-রাসূলগণের মতোই একজন মানুষ ছিলেন। তিনি মারা যেতে পারেন। তবে তিনি যে আদর্শ নিয়ে এসেছিলেন তা হলো অম্লান-অমর। প্রিয় নবীজীর চলে যাবার পর কেউ যদি সে আদর্শ ছেড়ে পশ্চাতে চলে যায় তাতে আল্লাহর কিছু যায় আসে না। বরং ক্ষতি হলে তারই হবে। এ আয়াত পরিষ্কার এ কথারই ইংগিত বহন করছে, প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ববাসীর প্রতি একটি মহান জীবনাদর্শের পয়গাম নিয়ে এসেছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে, 'তোমাদের জন্যে রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।'

মূলত এখানে এসেই একজন নবীপ্রেমিক মুমিনবান্দা খুঁজে পায় কিভাবে সে বরণ করবে তাঁর নবীর আগমন-প্রস্থানের শত স্মৃতি সুখ-দুঃখের অগণন ঘটনাসমৃদ্ধ মাস রবিউল আউয়ালকে।

সে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে রাসূলের আগমন ও বিদায়টা মূল বিষয় নয়। এটা সকল মানুষের জীবনেই আছে। বড় ছোট, সাধারণ অসাধারণের কোন সীমারেখা নেই এখানে। যেমন খাওয়া দাওয়া, চলা ফেরা ইত্যাদি। বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি মৃতপ্রায় মানবগোষ্ঠীকে

www.almodina.com

নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছেন। বন্যবরাহ হার মানতো যাদের পাশবিকতার কাছে- আকাশের নিষ্পাপ ফেরেশতারা আত্মসমর্পণ করেছে তাদের কল্যাণ কামনা, সততা ও খোদাভীরুতার কাছে। যেখানে ছিল না মানুষের নিরাপত্তা সেখানে ভাষাহীন উট পর্যন্ত নিজে মনিবের বিরুদ্ধে অভিযোগের সুযোগ পেয়েছে। এই তো সীরাতুন্নবী, এইতো রবিউল আউয়ালে আমাদের প্রাপ্তি। সেই চৌদ্দশ' বছর পূর্বের একটি রবিউল আউয়ালে।

দশম হিজরীতে সেই প্রাপ্তির লয় হয়নি, ক্ষয় হয়নি। নবীজীর শরীরী বিয়োগের আঘাতে সেই প্রাপ্তি আরো আবেদনশীল হয়েছে। তরঙ্গায়িত হয়েছে। সেই তরঙ্গের আঘাতে একের পর এক ভেঙ্গে পড়েছে জালিমের অবিচারী প্রাচীর। দুর্দমনীয় বিজয়ের মিছিল দেখে সকল পাপাত্মা দূর কোন ক্লেদের সন্ধানে ছুটে পালিয়েছে। এ ছিল সীরাতুন্নবীর ছন্দময় গতি। ইসলামের প্রথম যুগে।

ক্রমে আমাদের ঈমান আকীদায় ঘুন ধরতে শুরু করেছে। খোলাফায়ে রাশেদার পর থেকে। এতদিনে আমরা হারিয়েছি আরো অনেক কিছু। আকীদা বিশ্বাসের মূল শিকড়গুলোই এখন আলগা। তাই আমরা আর পূর্বের মত শিকড়শুদ্ধ বুঝতে চাই না কোন কিছু। প্রচ্ছন্নতার শিকার আমরা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই।

তাই দেখি, যেখানে রবিউল আউয়ালের আগমনে আমাদের ভেতর সীরাতুন্নবীর প্রিয়নবীজীর রক্তস্নাত আলোকময় আদর্শের একটা হিসাব নিকাশ হওয়ার কথা ছিল। কথা ছিল প্রিয় নবীজির স্মৃতিবিজড়িত এই মাসে আমাকে আমি জিজ্ঞেস করব একজন মুমিন হিসেবে, প্রিয়নবীজীর একজন উম্মতী হিসেবে বিগত বছরটিতে আমাকে আমি কতখানি ঢেলে গড়তে পেরেছি আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র উসওয়ার আলোকে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন, এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। আমি কি পেরেছি বিশ্বময় বিস্তৃত আমার সেই ভ্রাতৃত্বের হক আদায় করতে? অন্ত ত মানসিকভাবে! অন্যের ক্ষুধার যাতনা দেখে আমি কি বেদনা অনুভব করেছি? আমার ভাইকে অত্যাচারিত হতে দেখে কিংবা শোনে আমার রক্তে কি এইটুকু উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছে? হোক না সে বিশ্বের যে কোন প্রান্তে। ধর্ষিতা কোন মা-বোনের সংবাদ শোনে কি পেরেশান হই? বিচলিত হই আপন বোনের সংবাদের মত?

নবীজিতো একটি অঙ্গীকার রক্ষার তাগিদে পথে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিন দিন। আমি কি পারি আধ ঘন্টা দাঁড়াতে কিংবা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যথাসময়ে যথাস্থানে হাজিরী দিয়ে ওয়াদা রক্ষা করতে! রবিউল আউয়ালতো প্রতি বছর এসব কথারই

www.almodina.com

ডাক দিয়ে যায়

মিথ্যা বলা যাবে না। শিকার হওয়া যাবে না পরশ্রীকাতরতার। জীবনের কোথাও থাকবে না অহংবোধ। পরনিন্দা-পরোক্ষ নিন্দা কিংবা সমালোচনার পংকিলতায় সঞ্চালিত হবে না রসনা। এই তো ছিল নবীজীর চরিত্র। এই রবিউল আউয়ালে এসব সুন্দরতম গুণাবলীর মূর্তিমান আহ্বান নিয়েই তো তিনি আগমন করেছিলেন। বিদায়ী রবিউল আউয়ালে উম্মতের কাছে রেখে গেছেন তো এই আদর্শটিই। ভালোবাসার মাপকাঠিও নির্ধারণ করেছেন এটাকেই। ইরশাদ হয়েছে, "যে আমার আদর্শ (সুন্নত)কে ভালোবাসলো সে আমাকেই ভালোবাসল আর যে আমাকে ভালোবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"

বড় দুঃখ হয় তখন যখন এই রবিউল আউয়ালের বাঁকা চাঁদ দেখে নবীজীর ভালোবাসার বেসামাল ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি করি, সৃষ্টি করি সীরাত উদযাপনের নামে রঙ্গ-রসের কত আয়োজন- যার তান্ডবে শিকড়শুদ্ধ উৎপাটিত হয় নবীজীর সুন্নত। মুমিনের হৃদয়তো আরো অধিক ভারাক্রান্ত হয় তখন যখন সে দেখে তার স্বজনরা (মুমিনগণ) এই রবিউল আউয়ালে নবীজীর জন্মদিন পালনে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে ঘুনাক্ষরেও স্মরণ হয় না তাদের এই রবিউল আউয়ালেই তো প্রিয় নবীজীর ওফাত হয়েছিল। আর যাবার কালে রেখে গেছেন যে আদর্শ তার কথাতো ভাবাই ভার।

নবীজীর ইন্তেকালে কে না কেঁদেছে? প্রেমিকরা কাঁদবে কেয়ামততক। প্রেমিকরা এই মাসের প্রতিটি ক্ষণে হৃদয়ের কান পেতে শোনে নবীনন্দিনীর সেই অমর শোকগাঁথা।

'নবীজীর ওফাত আমাকে যে যাতনা দিয়েছে
তা যদি দিবসকে দিই দিবস রাত্র হবে।'

তাই পৃথিবীর প্রকৃত কোন নবীপ্রেমিকই এই রবিউল আউয়ালে পুলকিত হতে পারে না। আনন্দিত হতে পারে না। বরং নবীজীর বিচ্ছেদ যাতনায় সে তড়পায়। অস্থিরতায় কাটে তার রাত দিন। নবীজীর আদর্শ থেকে ছিটকে পড়ার বিগত দিনের প্রতিটি স্মৃতি, প্রতিটি ঘটনা তাকে খোঁচা দেয়, ঝাঁকুনি দেয়, তিরস্কার করে বলে যায় নিঃশব্দে তার অতীত দিনের সকল ব্যর্থতার কথা।

মুমিনের দিল তখন গলে যায়। নবীজীর প্রতি অব্যক্ত প্রেম তখন নাড়া দেয় তাকে। আর সে ভাবে, সত্যিই তো, এই রবিউল আউয়ালে আমার নবীজী এসেছিলেন এই মাটির ধরায়। জালিমের হাত চেপে ধরেছিলেন। অত্যাচারিতের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। অসহায় বঞ্চিতদের সাথে মিতালী করেছিলেন। অসত্যের প্রতি বিরাগিত করে তুলেছিলেন বর্বর একটি মানবগোষ্ঠীকে। যা সত্য তা বলতে

www.almodina.com

তিনি দ্বিধা করতেন না, লজ্জা করতেন না। অথচ আমি তাঁরই উম্মতী। আমার জীবন কত অন্ধকার। আসন্ন এই রবিউল আউয়াল থেকে আমি কি একটু আলো নিতে পারি না? এ মাসেইতো উদিত হয়েছিল নবুওতের শেষ সূর্য। সত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ তপন। হেদায়াতের চিরন্তন আলোর উৎস।

সে আরো ভাবে, সেই একটি রবিউল আউয়ালের আলোয় সারাজাহান হলো উজালা। অথচ আজ সেই উজালা আলোকময় অনেক ক্ষেত্রেই নেমে এসেছে আবার অন্ধকার। কিশোরদের মধ্যে নেই মায়ায মুআওয়াযের উদ্দীপনা, যুবকদের মধ্যে নেই আলীর (রা.) মত সাহসিকতা, উমরের মত উষ্ণতা। অবলা ওরা। যৌতুক ওদেরকে পিষ্ট করে। স্বাধীনতার টোপ গিলে ওরা লম্পটদের শিকার হয়। ওরা বড় অসহায়। দুর্বলরা আজ বড় সহায়হীন। এদের সকলের জীবনেই চাই সেই রবিউল আউয়ালে জ্বলা নববী প্রদীপের আলো। সেই আলো এলেই ঘুচে যাবে সব আঁধার। অধিকারের সকল সংঘাতের অবসান হবে তখন।

মুমিনের সকল ভাবনা অবশেষে দুর্ভাবনায় মিলিয়ে যায়- যখন দেখে সীরাতুন্নবী পালিত হচ্ছে সীরাতের (চরিত্র) পরিবর্তন হচ্ছে না। নবীজীর ভালোবাসার শব্দমালা উচ্চকিত হচ্ছে আর আয়োজনটি নবীজীর আদর্শ (সুন্নত) মাফিক হচ্ছে না। দেশময় পোস্টার, জলসা-জুলুস আর মাইকের বিকট শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে, নবরূপে বিকশিত হচ্ছে অথচ জীবন পাতায় একবিন্দু আঁচর পড়ছে না। নবীজীর নামে উৎসর্গিত বিশাল আয়োজন হচ্ছে কিন্তু নবীজীর বক্তব্য হাদীসে- রাসূল ওটাকে সমর্থন করছে না। মুমিনের ব্যথিত চিত্ত তখন নীরবে কাঁদে। প্রচন্ড ভয়ে। কারণ, নবীজী বলেছেন, যারা তাঁর আনীত দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করবে পরিবর্ধন করবে তাদেরকে তিনি হাশরের কঠিন মুহূর্তে হাউযে কাউছার পান করাবেন না। অজ্ঞাতে নবীজির ভালোবাসার নামে যারা হাদীস, কুরআন, ইজমা বিরোধী কান্ড কারখানা ঘটিয়ে যাচ্ছে তারাতো বড়ই হতভাগা। মুমিনের হৃদয়ে তাদের জন্য করুণা জাগে। কিন্তু তারা কি বুঝবে সেই ব্যথা।

রবিউল আউয়ালে কি তারা ফিরে যেতে পারবে সেই হেরার আলোর কাছে। বিশ্বের সকল মুমিনরা কি পারবে রবিউল আউয়ালে উদিত চির ভাস্বর নববী আলোয় আলোকময় করে তুলতে তাদের জীবনের সকল অঙ্গন? পারলে ভালো হবে। যেমনটি হয়েছিল আমাদের পূর্বসুরীদের। সাহাবায়ে কেরামের (রা.)॥

www.almodina.com

অনুপম চরিত্র মাধুরী

কোথাও নিরাপত্তা নেই। শান্তি নেই। সুন্দর নেই। নেই সুন্দরের আবেদন। মানুষে মানুষে মিল নেই। যুদ্ধ কলহ সর্বত্র। সকলেই যেন প্রতিহিংসার জ্বলন্ত নরক। কিংবা অত্যাচারীর ভয়ানক মূর্তি। বড়রা অসভ্য। ছোটদের সুকুমার বৃত্তিগুলো ঝলসে যাচ্ছে সেই অসভ্যতার দাবদাহে। জালিমের বেহায়া চিৎকারে হারিয়ে যাচ্ছে মজলুমের ফরিয়াদ। পৃথিবীর সে এক বীভৎস কাল।

ভালোর কথা কে বলবে সেখানে? ভালোকে চেনাবেই বা কি করে? সেখানে যে ভালোর কোন নমুনা নেই। আদি পিতা আদম (আ.) থেকে ঈসা মসীহ (আ.) পর্যন্ত যে সভ্যতা মহা সমাদরে লালিত হয়ে আসছিল তা এখন নেই। শয়তানের বন্ধুরা সব ওলট-পালট করে ফেলেছে। ভস্ম হয়ে গেছে সব। সংস্কৃতি সভ্যতার সবকটি ফুলদানীতে অসভ্যতার পরগাছা গজিয়েছে। সুন্দরে গোলাপ নেই এখন। পাগলামীর ধুর্তরা আছে। ওতে কেউ হাত দিতে চায় না। দিলে বিপদ আছে। এ বিপদ থেকে পানাহ্ চায় সকলে। অপরাধে অপরাধে ভারী পৃথিবী। এখানে এখন সকলেই অতীষ্ট।

অবক্ষয়ের এ কঠিন বলয় পেরিয়ে সকলেই বাঁচতে চায়। একটি সভ্যতার আলতো পরশে একটু শান্তি পেতে চায় প্রতিনিয়ত অত্যাচারে দগ্ধ পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী। আকাশ-বাতাস, গাছ-গাছালী, তরু-লতা, পশু-পাখি, নদী-নালা, ঝর্ণা-ফুয়ারা, পর্বত-লোকালয়, মরু-প্রান্তর, মানব-দানব সকলেই বাঁচতে চায়। পশু জীবন থেকে পরিচ্ছন্ন মানব জীবনের সন্ধান চায় তারা এমন একটি আশ্রয় চায় যেখানে সুন্দর আছে, সুন্দরের মূল্যায়ন আছে। ভালো আছে, আছে ভালো প্রতিপালন। নিরাপত্তা, ইনসাফ, বিশ্বাস ও আন্তরিকতার বন্ধন আছে যেখানে। যেখানে আছে পূর্ণাঙ্গ মানবতার দীপ্তিমান চিত্রায়ণ। অবশেষে সেই কামনা পূর্ণ হলো। সকল প্রত্যাশার বিমূর্ত বাস্তবতা নিয়ে ধরাধামে আগমন করলেন নিখিল দুনিয়ার রহমত, সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নিরাপত্তার সুখময় তৃপ্তিতে হেসে ওঠলো পৃথিবী। আর সকল সত্যসন্ধানীকে আহ্বান জানালেন করুণাময় আল্লাহ। আহ্বান জানালেন, সকলে মিলে তাঁকেই অনুসরণ করতে। জীবনের সর্বত্রব্যাপী তাঁর আনীত আদর্শ

www.almodina.com

বিশ্বাসকে লুফে নিতে।

পবিত্র সেই আদর্শের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ইরশাদ হয়েছে- 'তোমাদের জন্যে রাসূলের জীবনে রয়েছে এক উত্তম আদর্শ - উসওয়াতুন-হাসানা।" সত্যসন্ধানী সকল ভালো মানুষগুলো আঁকড়ে ধরলো সেই উসওয়াতুন হাসনা। রেঙে তুলল তারা নিজেদের যিন্দেগানী সেই অনুপম চরিত্র মাধুরীর রঙে। আখ্যা পেলো 'সোনার মানুষ' বলে। নবীদের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব কাফেলা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এই চরিত্রের স্পর্শে। কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের আদর্শ হিসেবে মনোনীত করলেন আল্লাহ সেই পবিত্র উসওয়াকেই।

কিন্তু কি সেই 'উসওয়াহ' কি সেই পবিত্রতম চরিত্র মাধুরী যার স্পর্শে বদলে যায় মানুষ, বদলে যায় সমাজ-সভ্যতা। দেশময় বয়ে চলে আনন্দ-উল্লাস, শান্তি -নিরাপত্তা আর অপার্থিব সুখের অনুগ্র বায়ু প্রবাহ। এই জিজ্ঞাসা নিয়েই একদিন হাজির হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর একটি জামাত। তাঁরা হাজির হলেন মা আয়েশার দরবারে। উম্মত জননীর দরবারে হাজির হলেন তারা নবীজীর পবিত্র চরিত্র ও আদর্শকে জানতে। কারণ, নবীজী এখন নেই। তিনি তাঁর প্রিয় মাওলার সকাশে চলে গেছেন। আর তার উম্মতের জন্য রেখে গেছেন তদীয় রক্তে স্নাত একটি জীবন্ত আদর্শ। সুতরাং এ আদর্শের কথা যে জানতেই হবে। আর নবীজীর চরিত্র সৌকর্য, মঙ্গলময়-কল্যাণ স্নিগ্ধ আদর্শের সাক্ষাৎ পেয়েছেন তিনি (রা.) নবীজীর একান্ত কাছ থেকে। তাই সকলে মিলে ঠিক করলেন, তাঁকেই জিজ্ঞেস করতে হবে নবীজীর চরিত্রের কথা।

তাঁরা গেলেন। সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলেন, নবীজীর চরিত্র কেমন ছিল? মা আয়েশা বললেন- 'কেন, তোমরা কুরআন পড়নি? কুরআন-ই তো নবীজীর চরিত্র!'

এবার সাহাবায়ে কেরাম বুঝলেন, কুরআনে যত কল্যাণ যত সুন্দর আর ভালোর কথা বলা হয়েছে সবই নবীজীর 'উসওয়াহ' নবীজীর চরিত্র।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত মনীষী ক্বারী তায়্যিব (রহ.) বলেছেন, 'নবীজীর জীবন ছিল আল কুরআনের বাস্তব নমুনা। অর্থাৎ কুরআনে বিশ্বের সকল মানুষকে যে আদর্শের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে তার নিখুঁত চিত্রায়ণ ঘটেছে প্রিয় নবীজীর জীবন পাতায়। তিনি ছিলেন আল কুরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। আল কুরআনে বর্ণিত প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর জীবনপাতায় অংকিত বাস্ত বায়িত সেই অনুপম চরিত্র মাধুরীর কয়েকটি দিক পত্রস্থ করছি আমরা এখানে।

সততা ও সত্যবাদিতা

www.almodina.com

ইসলামের সততা ও সত্যবাদিতা শুধু কথায় কিংবা ধর্মেই সীমাবদ্ধ নয়। সততা-সত্যবাদিতার পরিধি অনেক বিস্তৃত এখানে। আকীদা-বিশ্বাসে, কাজে-কর্মে, লেন-দেনে সর্বত্রই এর গুরুত্ব অপরিসীম। আকীদা বিশ্বাসে সত্যতা ও সত্যবাদিতার অর্থ হলো আল্লাহর প্রতি নিখাদ বিশ্বাস তাঁর সকল বিধি-বিধানের প্রতি শংকা ও সংশয়হীন সমর্পণ। এর ব্যতিক্রমের নামই আবার মুনাফেকী ভন্ডামী। যা কিনা ইসলামে অত্যন্ত ঘৃণিত। সততা ও সত্যবাদিতার প্রশংসা করে ইরশাদ হয়েছে- 'আল্লাহ তাআলা সত্যবাদীদেরকে তাদের সততার বিনিময় দিবেন, আর যদি চান তাহলে আযাব দিবেন মুনাফিকদেরকে।' (আহযাব : রুকূ : ৩)

কাজ-কর্মে, লেন-দেনে সত্যবাদিতার অর্থ হলো কোনরূপ ফাঁক-ফোকড় না রেখে কৌশল ও চাতুর্যের আশ্রয় না নিয়ে আল্লাহর দেয়া সমগ্র বিধানকে নীরবে অনুসরণ করে যাওয়া। এ বৈশিষ্ট্যে উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া পূর্ণাঙ্গ মুমিনও হওয়া যায় না। ইরশাদ হচ্ছে- 'প্রকৃত মুমিনতো তারা যারা আল্লাহর ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে। তারপর তারা সংশয়ে পড়েনি। নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করেছে। এরাইতো সত্যবাদী।" (হুজুরাত : রুকু : ২)

কথা ও কাজের এই সত্যবাদিতার বিমূর্ত প্রতীক ছিলেন প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কথার সততার কারণে তাঁকে ঘোর শত্রুর মুখেও 'আল-আমীন' সত্যবাদী বলে শোনা যেত। আল্লাহর প্রতি নিখাদ বিশ্বাস অবিচল আত্মসমর্পণ তাঁকে করেছিল অপার্থিব ঈমানী বলে বলীয়ান। সেই শক্তির সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই তিনি সকল মূর্তিপূজারীর সমুদ্রেও উচ্চারণ করেছেন এক আল্লাহর কথা। খেয়েছেন মার। শোণিতাক্ত হয়েছেন। শয়াবে আবি তালিবে অন্তরীণ হয়েছেন। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যে সরে দাঁড়াননি সত্যপথ থেকে। কারণ, সত্য বলা, সত্য মানা আর সত্যের উপর অবিচল থাকাইতো অনুপম আদর্শের প্রাণিকা শক্তি। তিনিতো সেই আদর্শেরই প্রতিবিম্ব।

এক খোদার দুশমন। দীনের দুশমন। মুসলমানদের অন্ধ শত্রু। নবীজী তাকে কতল করার নির্দেশ দিয়েছেন। সে ছিল ভারি চালাক। কৌশলে পৌঁছে গেল নবীজীর দরবারে। ক্ষমা চাইল সবিনয়ে। রহমতের নবী মাফ করে দিলেন। অথচ তার অপরাধ ছিল ক্ষমার অযোগ্য। তাই সে চলে গেলে নজীবী বললেন, সে যখন আমার সাথে কথা বলছিল, তোমাদের কেউ তার মস্তকটা উড়িয়ে দিতে পারলে না? সাহাবীগণ বললেন : হে রাসূল! আপনি চোখে একটু ইশারা করলেই তো পারতেন। নবীজী বললেন : না। নবীর চোখ খেয়ানত করতে পারে না। কত কঠিন সততা। জাত শত্রুর বিরুদ্ধে একটু অগোচরে চোখের পাতা নাড়াবেন তাও

www.almodina.com

পারছেন নাা। কারণ, তিনিতো মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী। তিনি মুখে ও মনে যখন তাকে ক্ষমা করতে যাচ্ছেন চোখের কোণে আবার বিরোধিতা করবেন কি করে?

অঙ্গীকার পূরণ

অঙ্গীকার পূরণ করাও সত্যবাদিতার একটি অংশ বিশেষ। সমাজ সভ্যতার একটি ভিত্তি। মানুষের পারস্পরিক বিশ্বাস ও সামাজিক শক্তির মহান উৎস এটা। প্রিয় নবীজীও ছিলেন এই গুণের পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি।

একবার এক ইহুদী নবীজীকে এক জায়গায় বসিয়ে বলল: আপনি বসুন। আমি আসছি। নবীজী বসে রইলেন। সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা। সে আসছে না। তিনি যেই ভাবেন, না হয়তো আসবে না লোকটি- সাথে সাথেই মনে হয়, আমি না অঙ্গীকার করেছি তার অপেক্ষা করব। এভাবে সেই মরুপথে অবিরাম অপেক্ষায় কেটে যায় তিন তিনটি দিন। লোকটি এদিকে জড়িয়ে পড়ে একটি ভিন্ন ব্যস্ততায়। ভুলে যায় নবীজীর কথা। তিনদিন পর কাজ সেরে যখন রাস্তায় নামে, দেখে নবীজী বসা। মনে পড়ে তার ওয়াদার কথা। বিব্রত হয় সে। ওযর জানায়। নবীজী তার প্রতি রাগ করেন না। শুধু ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দেন মাত্র।

এমন যাঁর চরিত্র পৃথিবীর সকল সৃষ্টি কি তাকে ভালো না বেসে পারে? আর সকলে যদি এমন হয়ে যায় তাহলে কি পৃথিবীতে আর অশান্তি থাকতে পারবে?

আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা

আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা ইসলামে একটি মৌলিক আদর্শ। সমাজ সভ্যতার বিশ্বস্ত আশ্রয় এটা। ইরশাদ হচ্ছে : নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা (তোমাদের কাছে রক্ষিত যাদের আমানত আছে তা) তাদের কাছে পৌঁছে দাও। (নিসা : রুকু :৮)

এই বৈশিষ্ট্যের মূর্তিমান বিকাশ ঘটেছিল নবীজীর পবিত্র জীবনে। তিনি যখন মক্কার সকল মানুষের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একত্ববাদের দাওয়াত দিলেন তখন সকল মিত্র হলো শত্রু। কেউ এখন আর তাঁকে কাছে ডাকে না। ভালোবাসে না। পাত্তা দেয় না। কারণ, যদি আবার সেই আসমানের কথা বলেন। সকলেই তাঁকে সাধ্যমত এড়িয়ে চলে। অথচ তখনও দেখা গেছে ওই শত্রুরাই তাদের গচ্ছিত অর্থগুলো নবীজীর কাছে আমানত রেখে যেত। গোপনে গোপনে। কারণ, তারা জানতো তিনি বিশ্বস্ত। আমানতের খেয়ানত তিনি করবেন না। করেনও নি।

এই পাষাণ শত্রুদের অত্যাচারে যখন রাতের আঁধারে দেশ ছেড়েছেন নবীজী তখনও ভুলেননি সেই আমানতের কথা। শত্রুদের সম্পদ হেফাযতের কথা। তাই শত্রুবেষ্টিত নবী ঘরে আল্লাহ ভরসা করে রেখে আসলেন জামাতা হযরত আলী

www.almodina.com

(রা.)কে। প্রকৃতপক্ষে 'রাসূলের জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ' বলে পরম করুণাময় তো আমাদেরকে আমানত ও বিশ্বস্ততার এই ছাঁচেই গড়ে ওঠতে বলেছেন। কিন্তু আমরা কি পারছি?

ন্যায়-ইনসাফ

ইনসাফ ও ন্যায়বিচার হলো মানবতা ও পাশবিকতার বিভেদ প্রাচীর। মানবতার সুউচ্চ মর্যাদাকে ভাস্বরিত করে তোলার লক্ষ্যেই নির্দেশ হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার। এ যেন মানুষকে মানুষ করে তোলার নির্দেশ। নির্দেশ মানব সমাজকে সুস্থ করে তোলার। ইরশাদ হচ্ছে- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিচ্ছেন ইনসাফ ও সদাচরণ প্রতিষ্ঠার।' (আন-নাহল : রুকু : ১৩)

এবার দেখা যাক কিভাবে চিত্রায়িত হয়েছে এই আদর্শ রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবন সৌন্দর্যে। এক বড় বংশের সদস্যা। চুরি করে ধরা পড়েছে। নবীজীর নির্দেশ হাত কাটতে হবে। এদিকে সকল সাহাবীই চাচ্ছেন বিষয়টি একটু হালকা করতে, বড় ঘরের নন্দিনী বলে। কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে বলার হিম্মত হচ্ছে না কারো। অবশেষে সবাই মিলে ঠিক করলেন উসামা ইবনে যায়দকে (রা.)। কারণ, তিনি রাসূলের (সা.) একান্ত প্রিয়জন। তিনি যখন নবীজীর সকাশে এই আরজি পেশ করলেন, রাগে রোষে রক্তিম হয়ে ওঠলো নবীজীর মুখশ্রী। আর বলে ওঠলেন জানো, নবী-নন্দিনী ফাতেমাও যদি চুরি করতো আমি নির্ঘাত তার হাত কেটে ফেলতাম। এইতো ইনসাফ যেখানে বড় ছোট বলতে কিছু নেই। যেখানে আছে শুধু হক ও অধিকারের সমাদর আর অন্যায়ের প্রতি প্রচন্ড ঘৃনা ও প্রতিবাদ।

সহনশীলতা

এক ইহুদীর কিছু পাওনা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ইহুদী এলো সেই পাওনা নিতে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের বেশ আগে। এসেই নবীজীর গায়ে জড়ানো চাদর টেনে ধরলো। একেবারে গলায় গামছা লাগাবার মত। নবীজীকে চেপে ধরেই শুরু করলো গাল মন্দ। বাপ দাদাশুদ্ধ। পাশেই দাঁড়ানো উমর (রা.) উমরী রক্ত উত্তেজনায় দৌড়াচ্ছে আপাদমস্তক। রক্তলাল দৃষ্টি। তীক্ষ্ণ নিবদ্ধ ইহুদীর দিকে। আর বলল: হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! অনুমতি দিন, গর্দান উড়িয়ে দেই।

নবীজী থামালেন উমরকে। বললেন, না উমর। আমি তো তোমার কাছে এমনটি কামনা করিনি। আমি এবং সে উভয়েই বরং তোমার কাছে প্রত্যাশী ছিলাম ভিন্ন কিছুর আমাদের প্রয়োজন ছিল আরেকটু আলাদা। তুমি আমাকে

www.almodina.com

বলতে ভালোভাবে তার হক দিয়ে দিতে। আর তাকে বুঝাতে উত্তমরূপে পাওনা তলবের কথা। তুমি কিন্তু তা করনি। যাও, একে নিয়ে যাও। তোমার অপরাধের দরুন তার নির্ধারিত পাওনার চাইতে অতিরিক্ত ২০ সা খেজুর দিয়ে দাও।

প্রিয় রাসূলের (সা.) এই সহনশীলতা দেখে ইহুদী ইসলাম গ্রহণ করলো। সত্যের দীপ্তজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠলো তার তমাসাচ্ছন্ন জীবন। এইতো সেই সহনশীলতা যার প্রশংসায় নাযিল হয়েছে আল্লাহর বাণী : "যারা সুসময় দুঃসময় (আল্লাহর পথে) খরচ করে, যারা হজম করে যায় রাগ রোষ, মানুষকে যারা ক্ষমা করে দেয় তাদের অপরাধ; নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এসব সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।" (আলে-ইমরান : রুকু : ১৪)

বিনয়

বিনয় মানবতার সর্বোচ্চ বিকাশ। সভ্যতা ও সামাজিকতার চালিকাশক্তি এটা। যার মধ্যে বিনয় নেই মানুষ তাকে হিংস্র ভাবে। ভয় পায়। দূরে সরে যায়। ক্রমে এই দূরত্ব বয়ে আনে বিচ্ছিন্নতা। তাই পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনয় হতে বলেছেন এইভাবে, 'আপনি আপনার বাহু মুমিনদের জন্যে অবনমিত করুন।' (হুজুর : রুকু : ৬) নবীজী অবনমিত হয়েছিলেন মুমিনদের জন্যে সকলের জন্যে। গাছ-গাছালী, পশু-পাখি সকলেই তার বিস্তীর্ণ বিনয় সীমায় আশ্রয় নিতো। অহংকারের ঔদ্ধত্য কখনো আহত করতো না তাঁর রেশম কোমল বিনীত স্বভাবকে।

তার বিনয় ছিল এমন, যে কারো সাক্ষাতে তিনি আগে সালাম দিতেন। করমর্দন করতেন। কেউ তাঁর রেশম কোমল করতল চেপে ধরলে কিংবা যে কোন আগুন্তক মুসাফাহা করলে তিনি আগে হাত টেনে নিতেন না। কেউ ডাকলে সবিনয়ে 'লাব্বাইক' এইতো আমি আছি- বলে জবাব দিতেন।

একবার তাঁর 'দুগ্ধ মা' হালিমা এলেন। নবীজীর আশেপাশে সাহাবীগণ। হালিমার গায়ে ছেঁড়া কাপড়। জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধা! কিন্তু নবীজী! একটু ইতস্তত করলেন না। সবিনয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। নিজের মাথার পবিত্র পাগড়ী বিছিয়ে দিলেন। নিজের আসনে বসতে দিয়ে সবাইকে বললেন: জানো ইনি আমার 'মা'। নবী নন্দিনী ফাতেমা এলেও তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন। ললাটে চুমু খেতেন বসতে দিতেন নিজের আসনে।

তিনি কারো প্রতি পা বাড়িয়ে বসতেন না। সকলের সাথে কথা বলতেন হেসে। নমিত কণ্ঠে। উঁচু স্থানে বসতেন না। তাঁর আসন হতো না স্বতন্ত্র, একটু আলাদা। নবাগত কেউ বুঝতেই পারতো না মুহাম্মদ (সা.) কে?

হিজরতের সময় যখন মদীনায় এলেন সঙ্গে ছিলেন আবু বকর (রা.)। সকলে

www.almodina.com

মিলে তাঁকেই মুহাম্মদ (সা.) ভাবতে লাগলো। বিষয়টি টের পেলেন হযরত আবু বকর। উঠে দাঁড়ালেন। এক খন্ড বস্ত্র মেলে ধরলেন নবীজর উপর। তখন সবাই বুঝলো ইনিই আমাদের 'প্রতীক্ষিত মেহমান'।

ধৈর্য ও ক্ষমা

কাউকে অত্যাচারে অতীষ্ট হয়ে কটু কিছু বলতেন না তিনি। কঠিন অসাধ্য সাধনেও ধৈর্যচ্যুত হতেন না। তায়েফের বালকরা কত যে নিষ্ঠুর আচরণ করেছে। কোন দোষ নেই নবীজীর। কটু কথাও বলেননি কাউকে। আঘাত করেননি। ক্ষতি করেননি কারো। অথচ ওরা মারছে নবীজীকে। হাতে নয়। পাথর মারছে। পাথরের বৃষ্টি! নবীজীর গা বেয়ে রক্ত নামছে। আর রক্তের সাথে জুতো লেগে গেছে। নবীজী মাটিতে পড়ে গেছেন নবীজীর শক্তিও কম নয়। ফিরিশতাগণ তাঁর সাহায্যে প্রস্তুত। কেবল অনুমতি চাই। অনুমতি দেননি তিনি। দুআ করেছেন, হে আল্লাহ! ওদেরকে ক্ষমা করে দাও।

এক পাপিয়সী ইহুদী। দাওয়াত করেছে নবীজীকে। মতলব তার ভালো ছিল না। বিষ মিশিয়ে ছিল খাবারের সাথে। দয়াল নবীজী তাকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন বিনা প্রার্থনায়।

হোববান বিন আসওয়াদ। দুর্দান্ত কোরেশী। নবীজীর আদরের দুলালীর ঘাতক সে। হযরত যায়নাব (রা.) যখন মদীনায় আসছিলেন আপন পিতার কাছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে। পথিমধ্যে তাকে বর্ষাঘাত করে এই কোরেশী। যায়নাব (রা.) মারা যান কিছু দিন পর এই আঘাতে। নবীজী এই কঠিন পাপাত্মাকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

নবীজীর এই মহান বৈশিষ্ট্যের প্রতিই পৃথিবীর সকল মানুষকে আহ্বান করছে আল কুরআন এই ভাবে- ধৈর্য ধারণ করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বৃথা যেতে দেন না। (হুদ : রুকু :১) 'হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ কর। পরস্পরকে ধৈর্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ কর। আল্লাহর পথে সংগ্রামের জন্যে পূর্ণ প্রস্তুতি নাও। আল্লাহকে ভয় কর। হয়তবা সফলকাম হবে। (আলে-ইমরান : রুকু : ২০)

ক্ষমার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে আল কুরআন এইভাবে : "মুমিনদের উচিত (যারা তাদের প্রতি কোন অবিচার করে, অপরাধ করে তাদেরকে যেন) তারা ক্ষমা করে দেয়, তাদের অপরাধ যেন পাশ কেটে যায়। তোমরা কি চাও না, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (আন-নূর : রুকু : ৬)

ক্ষমা ও ধৈর্যের এই মহান আহ্বানকে বাস্তব জীবনে এঁকে দেখিয়েছেন আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

www.almodina.com

নবীজীর ক্ষমা ও ধৈর্যের প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুট হয়ে ওঠেছে আরও সুন্দরভাবে তখন, যখন এক অচেনা অতিথি এলো। আতিথ্য গ্রহণ করলো নবীজীর। নাম নাজানা এক অজ্ঞাত মুসাফির মেহমান। রাতের আহার শেষ। বিশ্রাম করত দেয়া হয়েছে আলাদা ঘরে। শুয়েছে ক্লান্ত মেহমান। ঘুম ধরেছে খুব। এদিকে জঞ্জাল হয়েছে পেটে। সামাল দিতে পারেনি বেচারা। অবাধ্য যন্ত্রটি নিয়ন্ত্রণ মানেনি। বেরিয়ে পড়েছে। বিছানা পাটি নষ্ট করে ফেলেছে। ছড়িয়ে পড়েছে জমাট দুর্গন্ধ।

বিপাকে পড়েছে বেচারা। কি করবে! অবশেষে পালিয়ে বেঁচেছে।

ভোর হতেই নবীজী গেলেন তার সন্ধানে। কিন্তু মেহমান নেই। দুর্গন্ধ পেয়ে তলিয়ে দেখলেন। বিছানা নাপাক। নবীজী পেরেশান হলেন। না জানি কত কষ্ট হয়েছে লোকটির। পথ ঘাট চেনা ছিল না। কি অনুপম আখলাক! এক অচেনা মানুষ। এতবড় জঞ্জাল বাধিয়ে গেল। অথচ তার প্রতি কোন অভিযোগ নেই। আছে কেবল সমবেদনা। অবশেষে নিজ হাতেই সব ময়লা ধুয়ে মুছে সাফ করলেন নবীজী।

দান

আল্লাহ পৃথিবীর সকল মানুষকে সমান সম্পদ দেননি। বরং ধনী-গরীবে বিভক্ত করেছেন। ধনীরা গরীবদের প্রতি আর্থিক সাহায্য দেবে আর গরীবরা দেবে কায়িক সাহায্য। এ দুয়ের বন্ধনে শক্তিশালী হয়ে গড়ে ওঠবে মানব সমাজ। সভ্যতা হবে দৃঢ়তম। পরস্পরের প্রতি আন্তরিকতা সৃষ্টি হবে। গড়ে ওঠবে সকল মানুষ একই পরিবারের সদস্য হয়ে। আল্লাহর পরিবার!

অন্যের প্রতি উদারচিত্তে সম্পদ বিলাবার দাওয়াত দিয়েছে আল কুরআন এইভাবে : 'হে ঈমানদারগণ! সেদিন আগমনের পূর্বেই আমার দেয়া রিযিক থেকে (আমার পথে) খরচ কর, যেদিন কোন বেচা-কেনা নেই, বন্ধুত্ব নেই, নেই কোন সুপারিশ; অর্থাৎ কোন বেচা-কেনার সুযোগ থাকবে না, কোন বন্ধুত্বও উপকারে আসবে না, উপকার করবে না কোন সুপারিশ। (বাকারা : রুকু : ৩৪)

আল্লাহ'র রাহে দান করার মর্যাদা বর্ণনা করে এবং এ পথে উৎসাহিত করে আরও ইরশাদ হয়েছে : 'যারা আল্লাহর পথে স্বীয় সম্পদ ব্যয় করে তাদের তুলনা হলো এমন যেমন একটি শষ্য দানা। সেই দানা থেকে সাতটি ডগা গজিয়েছে। প্রতিটি ডগায় ধরেছে একশটি দানা। আল্লাহ যাকে চান তাকে আরও বাড়িয়ে দেন।' (বাকারা : রুকু : ৩৫)

নবীজীর জীনের চিত্রায়ণ ছিল অতিভাস্বর-উজ্জ্বলতম।

একবার নবীজী বসে আছেন হুজরা শরীফে। এক বালক এসে একটি কাপড় চাইলো। বলল: মা বলেছেন একটি কাপড়ের কথা। রাসূল (সা.)-এর গায়ে তখন

www.almodina.com

একটি মাত্র কাপড়। তিনি বালকটিকে বললেন। ঠিক আছে। এখন যাও। কোন কাপড় এলে অবশ্যই পাবে। এখন আমার কাছে গায়ের চাদরটি ছাড়া আর কোন কাপড় নেই। চলে গেল বালকটি।

একটু পরে ফিরে এলো আবার। এসে বলল, মা বলেছেন আপনার গায়ের চাদরটিই দিয়ে দিতে। এবার আর না করতে পারলেন না। কারণ, কাউকে কোন বিষয়ে না করতে তাঁর দারুণ কষ্ট হয়। একমাত্র গায়ের চাদরটি খুলে দিলেন। কিন্তু নাঙ্গা গায়ে বেরোবেন কি করে। বসে রইলেন হুজরাখানায়।

এদিকে আযান হয়েছে। সাহাবীগণ মসজিদে অপেক্ষা করছেন। নবীজী আসছেন না। এমনতো হয় না কখনো। কোন বিপদ হয়নি তো! অপেক্ষা থেকে আশংকা। রীতিমত ভয়!

একজন ওঠে আসলেন। ডাকলেন নবীজীকে হুজরাখানার বাইরে থেকে। নবীজী কথা বললেন। দেরী হবার কারণ বললেন। সাহাবী দ্রুত একটি কাপড় এনে পেশ করলেন পবিত্র খেদমতে। বেরিয়ে এলেন প্রিয়তম রাসূল। ইমামত করলেন মসজিদে।

সারকথা, পবিত্র কুরআনে যত সুন্দর, সত্য, সচ্ছতা, মানবতা ও কল্যাণময় গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে তার নিখুঁত নিখাদ ও পরিপূর্ণ চিত্রায়ণ ঘটেছিল প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে। আর সে কথাই বলেছিলেন হযরত আয়েশা (রা.)। আল্লাহ তাআলাও বিশ্বের সকল মানুষকে আহ্বান করেছেন সেই অনুপম চরিত্র মাধুরীর আলোয় উদ্ভাসিত হবার। আরো বলেছেন: 'রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর আর যা বর্জন করতে বলেছেন তা বর্জন করে চল।" আরো বলেছেন- 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করলো সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো।"

এক সময় মুসলমানগণ প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই আদর্শ অনুসরণ করে সারা পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হবার গৌরব অর্জন করেছিল। এটা সন্দেহাতীত সত্য, মানব সমাজের উন্নতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক ও চারিত্রিক সকল ক্ষেত্রে গৌরবময় উত্তরণের পথ হলো আদর্শ। আদর্শহীন কোন জনগোষ্ঠী সাদরিত হতে পারে না, হতে পারে না তাদের জীবন সুন্দর ও সুস্থ। পৃথিবী আশা করতে পারে না তাদের কাছে ভালো কিছু। তাই আজকের এই সকরুণ অবক্ষয়ের মুহূর্তেও যদি মুসলমানগণ ফিরে পেতে চায় তাদের হারানো অতীত তাহলে তাদেরকে অনুসরণ করতে হবে প্রিয় নবীজীর পবিত্র উসওয়া-আদর্শকে। সুতরাং সেই আদর্শের পথেই হোক আমাদের নবযাত্রা। আদর্শিক প্রত্যয়ে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠুক আমাদের জীবন। আমীন।

www.almodina.com

নবীজীর প্রতি ভালোবাসা : গুরুত্ব ও স্বরূপ

প্রেম ও ভলোবাসা মানুষের স্বভাবজাত গুণ। জন্মগতভাবেই একটি মানুষ যেভাবে খাবার দাবারের প্রতি আগ্রহ অনুভব করে, দরদ অনুভব করে জীবন ও স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি, ঠিক তেমনিভাবে সে আবেদন অনুভব করে অন্য মানুষের প্রতি, টান ও আকর্ষণ খুঁজে পায় মা-বাবাসহ নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি। মানুষের মজ্জাগত এই আবেদন, সৃষ্টিগত এই আকর্ষণ অনুভবই ভালোবাসা, এরই আরেকটি শৈল্পিক নাম প্রেম ও মহব্বত।

বলাবাহুল্য, মানুষ একটি সমাজবদ্ধ জীব। সামাজিকতার সুস্থ স্পন্দনই মানুষকে সুস্থ ও নিরাপদে বাঁচতে সাহায্য করে। যে কারণে পৃথিবীতে যত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, হয়েছে যত সংগ্রাম, সকল বিপ্লবীই সেই সমাজের সুস্থতা, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি আর সুশোভনের কথাই বলেছেন। অবশ্য প্রক্রিয়া তাদের এক ছিল না। তাদের কেউ কেউ মনে করতেন, সম্পদের সুষম বন্টন হলেই সমাজ পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, আবার কেউ বলতেন শ্রেণী দ্বন্দ্বই সকল অনিষ্টের মূল। কারো কারো সংগ্রাম ছিল আবার জাতির শিক্ষা কেন্দ্রিক। কিন্তু সকলের শ্লোগান ছিল সেই একটিই। আর তাহলো, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তা ও সুস্থতা ছাড়া মানুষ সুস্থ ও নিরাপদ থাকতে পারে না। কথাটি বাস্তব ও যথার্থ। কিন্তু এর চাইতেও আরো অধিক বাস্তব সত্য হলো, মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বাঁচতে হলে চাই পারস্পরিক আবেদন নিবেদন, আকর্ষণ ও সম্পর্ক। এছাড়া মানুষ মুহূর্তকালও সুস্থ থাকতে পারবে না। আর এ সম্পর্কের নামই ভালোবাসা। যা আল্লাহ তাআলা জন্মগতভাবেই মানুষের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা আছে বলেই একটি অবুঝ শিশু বেঁচে থাকতে পারে। কথা বলতে না পারলেও, নিজের প্রয়োজনের কথা ভাষায় না আনতে পারলেও তার প্রয়োজন অপূর্ণ থাকে না। বরং তার প্রয়োজনের প্রতি তার চাইতে তার মায়ের দৃষ্টিই থাকে অধিক সচেতন। অনুরূপ সন্তানের হৃদয়ে মায়ের ভালোবাসা বাবার প্রতি অনুরাগ তার স্বভাবজাত। তাই মা-বাবা যখন বার্ধ্যক্যে উপনীত হন সন্তানের ভালোবাসা নির্ভর হয়ে বাঁচতে শুরু করেন তাঁরা। সন্তান তার শত ব্যস্ততার মধ্যেও বৃদ্ধা মায়ের কথা স্মরণ করে বারবার। পরম করুণাময়ের এ এক অপার

www.almodina.com

মহিমা। মূলত মানব সমাজের এই খোদাপ্রদত্ত- বৈশিষ্ট্যটি বাদ দিয়ে পৃথিবীর কোন সমাজ ব্যবস্থাই সুস্থভাবে টিকে থাকতে পারবে না।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, ইসলাম মানুষের এ ভালোবাসার মূল্যায়ন করেছে কতটুকু এবং কিভাবে মূল্যায়ন করেছে? ইসলামে এর ধরা বাঁধা কোন নিয়মনীতি আছে, না এ ভালোবাসা কোন প্রবৃত্তি চর্চার উন্মুক্ত ময়দান? ধর্মপ্রাণ মুসলিম মানুষের কাছে এ এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা।

প্রকৃত সত্য হলো, ইসলাম একটি স্বভাবজাত ধর্ম। মানুষ স্বভাবগতভাবে নিজের ভেতরে যে সুন্দর স্বপ্ন দেখে ইসলাম কখনো তার বিরোধিতা করে না। তবে সে স্বপ্ন যেন অন্যায় পথে পরিচালিত হয়ে মানুষের ধ্বংস ডেকে না আনে সে জন্যে কিছু বিধি-নিষেধও দিয়েছে ইসলাম। অধিকন্তু তার স্বভাবজাত প্রতিটি গুণের সুশোভিত বিকাশের মাধ্যমে সে যেন বিপুল উন্নতি লাভ করতে পারে সে পথও বাতলে দেয় ইসলাম। আর এ কারণেই মানুষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রেম ও ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু কি, কাকে সে ভালোবাসবে, কার জন্যে নিবেদিত হবে তার নিবেদন অনুরাগ এবং স্বরূপ প্রকৃতিই বা কি হবে (?) এসব কিছুই আলোচিত হয়েছে ইসলামে।

সন্দেহ নেই, মানুষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ভালোবাসা'রও কিছু উৎস আছে। এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলোর কারণে মানুষ অন্যকে ভালোবাসে। সংক্ষেপে ভালোবাসার এসব গুণাবলী তিনটি। এক. অনুগ্রহ। দুই. ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা। তিন. সৌন্দর্য। অর্থাৎ, মানুষ যার কাছ থেকে কোন প্রকার অনুগ্রহ পায় সে তার প্রতি দুর্বল থাকে, তাকে সে ভালোবাসে। কোন ব্যক্তির মধ্যে গুণগত পূর্ণতাও তার প্রতি অন্যের আকর্ষণ সৃষ্টি করে থাকে। একজন বড় শিক্ষাবিদ, বড় শিল্পী কিংবা দার্শনিককে না দেখে শুধু তার নাম শোনেই মানুষ তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে, তার প্রতি অনুরাগ অনুভব করে। আবার আত্মীয়তার পরশে সহজেই গলে যায় একে অন্যের জন্য। এটা মানুষের স্বভাব। আর বাহ্যিক সৌন্দর্যতো প্রথম সাক্ষাতেই মন দিল হরণ করে নেয়, হৃদয়ের অনুভব, প্রেম ও মহব্বতের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠে সুষম সৌন্দর্যের যে কোন বস্তু। অনুগ্রহ, পূর্ণতা-যোগ্যতা আত্মীয়তা ও সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের ভাব অনুরাগ যে একটি প্রাকৃতিক সত্য ও বাস্তবতা তার প্রমাণ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ দিয়ে চলছে প্রতি ক্ষণে জ্ঞাতে কি অজ্ঞাতে। এ ক্ষেত্রে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার কোন পার্থক্য নেই, ধনী গরীব কিংবা সাদা কালোরও কোন প্রভেদ নেই। সকলেই এ ক্ষেত্রে সমান। একটি অবুঝ শিশুর জীবনেও ব্যতিক্রম দেখা যায় না এর।

মূলত প্রাকৃতিক এ সত্যকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে গিয়েই ইসলাম ঘোষণা

www.almodina.com

করেছে, হে মানুষ! তোমাকে কেউ কিছু অনুগ্রহ করলেই যখন তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়, কারো যোগ্যতা ও পূর্ণতার স্পর্শেই যখন তার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ অনুভব কর, আত্মীয়তার লেশ পেলেই যখন নিবেদিত হয়ে পড়, যে কোন সৌন্দর্য সুষমাই যখন তোমার হৃদয় মন গ্রাস করে ফেলে, অনন্তর তুমি তার ভক্ত অনুরক্ত হয়ে পড়, তাহলে একবার ভেবে দেখোতো, প্রিয়তম প্রভুর চাইতেও তোমার প্রতি বেশি অনুগ্রহ করেছে কি কেউ? যিনি তোমার অস্তিত্ব থেকে শুরু করে দেহ অবয়ব, জ্ঞান-বুদ্ধি, সম্মান-প্রতিপত্তি সব কিছু দিয়েছেন। যিনি কোন প্রতিদান ছাড়াই তোমার লালন পালন করছেন, তোমার মেধা বিবেচনা কি তাঁর অনুগ্রহ গণনা করে শেষ করতে পারবে? আর পৃথিবীর কোন নিকটাত্মীয়ও কি তার আপনজনদের প্রতি এমন অনুগ্রহ করতে পেরেছে। অধিকন্তু তার যোগ্যতা, গুণাবলীর পূর্ণতা সেতো তোমার বোধির ঊর্ধ্বে। তার নিখুঁত সৃষ্টিজগত দেখে এর কিছুটা অনুমান করতে পারবে। ইরশাদ হচ্ছে- 'তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিতে কোন তফাত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফিরাও; কোন ফাটল দখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ- তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।" (সূরা মুলক : ৩-৪) আর বান্দার প্রতি অপার অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে ইরশাদ হয়েছে- 'যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামতকে গণনা করতে চাও তাহলে তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না।" (সূরা নাহল : ১৮) আর আল্লাহর সৌন্দর্য সুষমা? সেতো অনুভব-অনুভূতিরও অনেক ঊর্ধ্বে! হযরত মূসা (আ.) তো ইলাহী নূরের এক প্রতিঝলক প্রত্যক্ষ করেছিলেন 'তূর' পর্বতে। তাও সয়ে নিতে পারেন নি। ইরশাদ হয়েছে- 'পড়ে গেল মূসা বেহুঁশ হয়ে'। (সূরা- আরাফ : ১৪৩) তাই পরম করুণাময়ের সুষম সৌকর্য সম্পর্কে কুরআনের এই ভাষ্যই যথেষ্ট- 'লাইসা কামিছলিহী শাইউন' অর্থাৎ তাঁর তুলনা শুধু তিনিই।

মানুষ যে উৎসত্রয়ের প্রেক্ষিতে একে অপরকে ভালোবাসে, সেই উৎসগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে বিবেচনা করলে সে সহজেই বলতে বাধ্য হবে, আমার প্রেম আমার ভালোবাসা আমার জীবন আমার মরণ আমার সবকিছু সেই মহান সত্তার তরেই নিবেদিত হোক যিনি আমার সৃষ্টিকর্তা, যিনি আমার পালনেওয়ালা যেমনটি বলেছিলেন আমাদের আদি পিতা ইবরাহীম (আ.)। কুরআনের ভাষায়- 'নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার হজ, আমার জীবন, আমার মরণ বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্যে।' আল্লাহর প্রতি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভালোবাসা ছিল সদ্যোদ্ধৃত আয়াতটির মতোই। আল্লাহ প্রেমের এক নিখুঁত নিখাদ প্রতিচ্ছবি তাঁর জীবনালেখ্য। নমরূদের ঔদ্ধত্য ও অহংকারের ত্রাসে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা,

www.almodina.com

একমাত্র আদরের দুলাল ইসমাইল (আ.)-এর কুরবানীর নির্দেশও যে পথ থেকে মুহূর্তের জন্যেও বিচ্যুত করতে পারেনি তাঁকে। তাঁর সে ভালোবাসা এতটা গৃহীত হয়েছে আল্লাহর দরবারে যে, 'খলীলুল্লাহ' আল্লাহর বন্ধু অভিধায় ভূষিত হয়েছেন তিনি। আর তাঁর মিল্লাত হয়েছে মুসলমানদের মিল্লাত-ধর্ম। ইরশাদ হচ্ছে- 'এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্ম। তিনিই ইতিপূর্বে তোমদের 'মুসলমান' নামকরণ করেছেন এবং এতেও (অর্থাৎ কুরআনেও) এ নামই রাখা হয়েছে।" (সূরা- হজ : ৭৬০)

সুতরাং একথা আর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন রাখে না, মানুষ সর্বাধিক ভালোবাসবে কাকে এবং সে ভালোবাসা কেমন হবে? কারণ, তার প্রকৃতিগত দাবী অনুসরণেই সে আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে। আর সে ভালোবাসা হবে সকল ভালোবাসার ঊর্ধ্বে পৃথিবীর অন্যকোন বাধা এ পথে আড়াল সৃষ্টি করতে পারবে না। এটাই সুস্থ বিবেকের দাবী যেমনটি ঘটেছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জীবনে

তবে এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে, স্থূল প্রশ্ন। মানুষ বস্তু-সর্বস্ব নয় একথা ঠিক। তবে তার তনু দেহ পুরোটাই যে বস্তু দ্বারা সৃষ্ট এতেও কোন সন্দেহ নেই। আর সন্দেহ নেই বলেই বস্তুর প্রতি মানুষের দুর্বলতা প্রকট এবং তা ইসলামেও অবহেলিত নয় বরং সম্মানে বরিত। তাইতো দেখি আল্লাহ নিজের সামনে, শুধু তাঁরই জন্যে সেজদা ফরয করলেও সেই সেজদার কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছেন 'বস্তুসৃষ্ট' কাবাঘর। দৈনিক পাঁচবার সেই কাবাকে কেন্দ্র করেই লক্ষ কোটি বনূআদম সিজদাবনত হচ্ছে। বছরে একবার প্রভুর প্রতি অগাধ প্রেম নিবেদন করছে সেই কাবা প্রদক্ষিণ করেই। তাই প্রশ্ন জাগে, আল্লাহকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে কি ইসলাম এমন কোন বস্তুগত নিদর্শন রাখেনি? স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে ব্যবধানতো বিশাল বেহিসাব। মাটির মানুষ যাকে ভালোবাসে সেতো তাঁকে দেখতে চায় তার পাশে দাঁড়াতে চায়, তাঁর অনুকরণ কতে চায় পদে পদে। আল্লাহকে ভলোবেসে কি সে তার এই তপ্তকামনা পূরণ করতে পারবে? কিভাবে করবে, সেতো আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে না, দেখা সম্ভবও নয়, এই পার্থিব জগতে! আর অনুকরণ অনুসরণের তো প্রশ্নই উঠে না।

বস্তুত এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে রাসূল! আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর। (আলে-ইমরান : ৩১)

মানুষের এটা স্বভাব, তার প্রাকৃতিক দাবী, সে যাকে ভালোবাসে তার সে অনুসরণ করে। আমাদের সমাজজীবনে এর দৃষ্টান্ত বিপুল। আমরা নিয়মিতই

www.almodina.com

লক্ষ্য করি, বোম্বের কোন চিত্র তারকা যখন সুরুচি কি কুরুচির কোন একটা নতুন পোশাক পরে, তখন পাক বাংলা ভারতের সকল তারকা প্রেমিকরা সে পোশাকের পুচ্ছ ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আসলে এটা মানুষের স্বাভাবিক স্বভাব। তার এই স্বভাব কামনা ইসলামেও উপেক্ষিত হয়নি। বরং বলা হয়েছে, তোমরা যারা আল্লাহপ্রেমিক তারা প্রিয় নবীজীর অনুকরণ কর, পোশাক পরিচ্ছদ, চাল-চলন, রীতিনীতি সর্বক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ মানেই তোমাদের প্রকৃত প্রেমাস্পদ আল্লাহর অনুসরণ। কারণ, তিনিই ইলাহী চরিত্রের বাস্তব প্রতিমূর্তি। মানুষ যেহেতু আল্লাহকে দেখতে পায় না। অথচ আল্লাহকে ভালোবাসে এবং অনুসরণ করতে চায়- তাই এ ব্যবস্থা এবং বিকল্প ব্যবস্থা।

অধিকন্তু ভালোবাসার সকল উৎসের শৈল্পিক ও নিখুঁত সমন্বয়ও ঘটেছে প্রিয়তম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে। অনুগ্রহ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও বাহ্যিক সৌন্দর্যের মাপকাঠিতেও তিনি এক অপূর্ব সত্তা। সৃষ্টির মাঝে তাঁর তুলনা শুধু তিনিই।

উম্মতের প্রতি প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর অনুগ্রহ বেশুমার। কুরআনের ভাষায় তাঁর অস্তিত্বটাই ছিল বিশ্বজাহানের জন্যে রহমতস্বরূপ। তাঁর সে রহমত সকলের জন্যে অবারিত। আরব অনারব, সাদা কালো, ধনী গরীব সকলের জন্যেই তিনি ছিলেন সাক্ষাত রহমত, অপার অনুগ্রহ। শুধু মানুষেরই নয়। বিশ্বজাহানের জন্য। ইরশাদ হচ্ছে- 'আমি আপনাকে শুধুমাত্র সমগ্র সৃষ্টি জগতের রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।" (সূরা- হজ: ১০৭) তাঁর আগমনের পূর্বে এ পৃথিবী মারা-মারি, কাটা-কাটি, চুরি, রাহাজানি, অবিচার ব্যভিচার ও জুলুম অত্যাচারের একখন্ড নরকে পরিণত হয়েছিল। উত্তপ্ত সেই আদর্শ বিবর্জিত পৃথিবীতেই তিনি এলেন, রহমতের পাথেয় হাতে করে, জুলুমের ভারি হাওয়ায় ধ্বনিত হলো আবার শান্তি ও নিরাপত্তার সুর; মানুষ খুঁজে পেল মানুষের জীবন ও জীবনবোধ, বন্য প্রকৃতির মূর্খ মানুষ খেতাবে যারা স্মরিত হতো তারাই পরিচিতি লাভ করলো সোনার মানুষ রূপে। মূর্খযুগ রাতারাতি বদলে গেল সোনালী যুগে। সেই থেকে শুরু হলো পৃথিবীতে মানব সমাজের আরেক নতুন ইতিহাস। গোড়াপত্তন হলো সভ্যতার মানবতার। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মিলেও কি এই ঋণ শোধ করতে পারবে? কোনদিন পারবে না! সুতরাং সমগ্র মানবজাতির জন্যে যে মহামানবের এ বিশাল অনুগ্রহ, মানুষ তাঁকে ভালোবাসবে না তো কাকে ভালোবাসবে?

মানুষ ভালোবাসে আত্মীয়তার ভিত্তিতে। মানুষ যদি লক্ষ্য করে তাহলে সে সহজেই বুঝতে পারবে, তার সবচাইতে নিকটাত্মীয় হলো পরম দয়ালু আল্লাহ।

www.almodina.com

মানুষ পৃথবীতে সবচাইতে আপন জানে তার মা-জননীকে। 'মা' তার সর্বাধিক নিকটাত্মীয় বলেই মায়ের ত্যাগ ও অবদান তার জীবনে পৃথিবীর অন্য সকলের তুলনায় বেশি। জন্মের পূর্ব থেকে তার মা তার জন্যে কত যে কষ্ট স্বীকার করেন তার ব্যাখ্যা কলমের তুলিতে আঁকা অসম্ভব। বরং সে এক গভীর অনুভবের বিষয়। যা একজন 'মা'ই বঝুতে পারেন, অনুভব করতে পারেন। কিন্তু যদি বলি, মায়ের হৃদয়ে সন্তানের প্রতি এ গভীর মমতা কে দিয়েছেন? মায়ের গর্ভে তার ক্ষুধা-তৃষ্ণায় খাবার যুগিয়েছেন কে? মায়ের সমতল বক্ষ স্ফীত হলো কার ইশারায়? নাতিশীতোষ্ণ দুধের আয়োজন হলো কার কুদরতে? দোলনা থেকে নিয়ে মরণ নাগাদ প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রীর আয়োজন করলেন কে? এসব প্রশ্নের উত্তর হবে 'আল্লাহ'। সুতরাং মায়ের চাইতে কি আল্লাহর সম্বন্ধ আরো গভীর নয়? আর হবেই না কেন? মা তো শুধু প্রসব করেছেন; সৃষ্টিতো করেছেন আল্লাহ।

আসা যাক প্রিয় নবীজীর প্রসঙ্গে। আল্লাহর পরে তিনিই মানুষের সর্বাধিক নিকটতম গভীর সম্বন্ধ সূত্রে গাঁথা। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন- 'নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ মুমিনদের মাতা।' (আহযাব : ৬) আলোচ্য আয়াতটিতে নবীজীকে মুমিনদের কাছে শুধু আত্মীয়-স্বজন নয় বরং নিজেদের জীবনের চাইতে অধিক ঘনিষ্ঠ বলা হয়েছে। আর প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণকে বলা হয়েছে 'মুমিনদের মাতা'। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর বাস্তব জীবনও এর সাক্ষী। উম্মতের প্রতি তাঁর দরদ ছিল সন্তানের প্রতি মায়ের দরদের চাইতেও বেশি। মা তার সন্তানের সর্বাধিক নিকটাত্মীয় বলে সন্তানের কোন দুঃখ বেদনা 'মা' সইতে পারে না। বরং সন্তানের বিপদ আশংকাও মায়ের ঘুম হারাম করে দেয়। কিন্তু মায়ের এ দরদ এ আশংকা পার্থিব জগতের দুঃখ-কষ্টকে কেন্দ্র করেই। অধিকন্তু এ ক্ষেত্রেও সন্তান কিভাবে গড়ে উঠলে তার জীবন সুন্দর নিরাপদ হবে এই ভাবনার চাইতে উপস্থিত ভাবনাই মাকে বেশি ব্যস্ত করে রাখে। তাছাড়া এই 'মা'ও বন্যার তান্ডব গ্রাসে নিজের জীবন বাঁচাতে গিয়ে সন্তানের বুকে পা রাখার ঘটনাও এখন আর দুর্লভ নয়। অথচ পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সম্পর্কে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর ভাবনা ছিল আরো গভীর; আরো শিকড়সমৃদ্ধ। তিনি ভাবতেন প্রতিটি মানুষের ইহকাল ও পরকাল নিয়ে। পৃথিবীর একটি মানুষও পার্থিব নির্যাতনের শিকার হবে, অবিচারগ্রস্ত হবে, একটি নারীও ধর্ষিতা হবে, বঞ্চিত হবে একটি শিশু, লাঞ্ছিত হবে একটি অসহায় প্রাণী, একটি শ্রমিকও তার উচিত

www.almodina.com

পাওনা পাবে না- এ যেন তাঁর ভাবতেই কষ্ট হতো। অধিকন্তু পরকালের বিশাল জীবনে, দোযখের দুবির্ষহ আগুনে দগ্ধীভূত হবে একটি মানুষ এ আশংকা তাঁকে সর্বদাই পীড়া দিত- প্রচন্ড পীড়া। সকলের তরে এই অগাধ দরদ আর নিখাদ ঘনিষ্ঠতাই তাকে সদা ব্যাকুল করে রাখতো। তিনি সর্বদাই ভাবতেন কি করে পৃথিবী নামের গ্রহটিকে একটি নিরাপদ আশ্রয়ে রূপান্তরিত করা যায়। কি করে প্রতিটি মানুষকে সহজে নির্বিঘ্নে বেহেশতে পৌঁছে দেয়া যায়। এ ছিল তাঁর ভাবনা, এ ছিল তাঁর সর্বক্ষণের চিন্তা-চেতনা। যে চেতনার টানে তিনি তায়েফে গিয়ে শোনিতাক্ত হয়েছেন; খন্দকে গিয়ে বেঁধেছেন পাথর আর লাশ হয়ে ফিরেছেন উহুদের ময়দান থেকে! কিন্তু এরপরও কি তিনি শান্ত হতে পেরেছিলেন? পারেননি! আর পারেননি বলেইতো আশংকা হচ্ছিল তিনি হয়তো উম্মতের ভাবনায় নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবেন! মানুষ যদি তাঁর কথা না শোনে সফলতার পথে শান্তি ও নিরাপত্তার পথে না আসে তাহলে বুঝি তিনি আর বেঁচে থাকতে পারবে না। কারণ, প্রতিটি মানুষের সাথে যে তাঁর অকৃত্রিম ঘনিষ্ঠতা, নিবিড় সম্বন্ধ যে সম্বন্ধ পৃথিবীর সকল আত্মীয়তারও উর্ধ্বে- বহু ঊর্ধ্বে। এ মর্মেই ইরশাদ হচ্ছে- 'যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে তবে তাদের পশ্চাতে সম্ভবত আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করে ফেলবেন।' (সূরা-কাহ্ফ : ৬) সুতরাং যদি ঘনিষ্ঠতা আর আত্মীয়তার কারণেই কাউকে ভালোবাসতে হয় তাহলে তো প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাধিক ভালোবাসার হকদার।

কারণ, তিনিতো শুধু দুনিয়াতেই ঘনিষ্ঠ এমনটি নন। পরকালে হাশরে যখন মা সন্তানের পরিচয় স্বীকার করবে না, নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে তখনতো একমাত্র ঘনিষ্ঠজন হবেন প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনিই তো সেদিন পরিচয় দিবেন। তাই যদি পৃথিবীর মধ্যে সকল মানুষের, বিশেষত সকল মুসলমানদের সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ সত্তা মায়ের চাইতেও নিকটাত্মীয় কেউ থাকেন তিনি হলেন একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুতরাং আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতার কারণে কাউকে ভালোবাসতে হলে সর্বপ্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই ভালোবাসতে হবে।

মানুষ সুন্দরের প্রতিও দুর্বল। সুন্দর কিছু দেখলে মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মর্যাদা ও গুণাবলীর উৎকর্ষের কথা আর জানত ক'জন? কিন্তু তাঁর অপার্থিব দেহ সৌকর্যতো সকলের হৃদয়েই আন্দোলন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। রাজ্যের সম্রাজ্ঞী থেকে দেশের সকল সেরা সুন্দরীতো একবার এক ঝলক দর্শনেই আপেলের পরিবর্তে আঙ্গুল

www.almodina.com

কেটে ফেলেছিল। শত শত বছর পর আজোতো মানুষ সেই শ্রুতিসত্য ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্য্যের পাক্কা আশেক অন্ধ ভক্ত। ইউসুফ-জুলেখা, লাইলী-মজনু আর শিরি ফরহাদের প্রেম রহস্যের মূল উৎসটাওতো দেখতে ভালো লাগা। এই যদি মানুষের সাধারণ স্বভাব হয় যে, সে সুন্দরকে ভালোবাসে, দেখতে যাকে ভালো দেখায় তার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়, নিবেদিত হয় তাহলে আসা যাক আমাদের প্রিয় নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রসঙ্গে। খুঁজে দেখা যাক দেখতে তিনি কেমন ছিলেন

'হযরত আলী (রা.)-এর পৌত্র ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ বলেন- হযরত আলী (রা.) যখন প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহাবয়ব বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক লম্বাও ছিলেন না অধিক বেঁটেও ছিলেন না; তিনি ছিলেন মাঝারি গড়নের। তাঁর কেশরাজি ছিল ঈষৎ কুঞ্চিত। তিনি স্থূলদেহীও ছিলেন না একেবারে হালকা পাতলাও ছিলেন না। তাঁর মুখশ্রী পূর্ণ গোলাকারও ছিল না, ছিল লম্বার ও গোলের মাঝামাঝি আকৃতির, নূরোজ্জ্বল মুখমন্ডল। গায়ের রং ছিল লালচে সাদা। পবিত্র চক্ষুদ্বয় ছিল গভীর কৃষ্ণবর্ণের। পলক ছিল তাঁর দীর্ঘ। উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী জায়গাটুকু ছিল মোটা ও মাংসল। বক্ষ থেকে নাভি পর্যন্তচুলের রেখা ছিল। যখন তিনি হাঁটতেন, তখন পদযুগল শক্তি সহকারে উত্তোলন করতেন, যেন উপর থেকে নীচে নামছেন।

জাবির ইবনে সামুরা (রা.) বলেন- 'আমি একবার চাঁদনী রাতে রাসূলে কারীমসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নিরীক্ষণ করছিলাম। তিনি তখন লাল বস্ত্রজোড়া পরিহিত ছিলেন আমি কখনো চাঁদের দিকে তাকাচ্ছিলাম, কখনো তাঁর দিকে। অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদ অপেক্ষাও অনেক বেশি সুন্দর সুশ্রী ও নূরোজ্জ্বল।'

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন- 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিস্কার, স্বচ্ছ, সুশ্রী ও সুন্দর ছিলেন। মনে হত যেন তাঁর শরীর মুবারক রৌপ্য দ্বারা নির্মিত। তাঁর কেশগুচ্ছ কিছুটা কুঞ্চিত ছিল।'

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বলেন- 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনের দন্ত মুবারক কিছুটা প্রশস্ত ছিল। ঈষৎ ফাঁক দন্তসারিতে। যখন তিনি কথা বলতেন, তখন যেন নূর প্রকাশ পেত, যা দন্তপাটির মধ্য থেকে বিচ্ছুরিত হত।'

হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন- হযরত ইউসুফ (আ.)কে দেখেতো মিশরের মেয়েরা আঙ্গুল কেটে ফেলেছিল। তাঁরা যদি আমার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.almodina.com

ওয়াসাল্লাম-কে দেখতো তাহলে তারা তাদের হৃদয় কেটে ফেলত। হ্যাঁ, হযরত ইউসুফ (আ.) অনিন্দ্য সুন্দর ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর সৌর্ন্দযে ঔজ্জ্বল্য বেশি ছিল। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সৌন্দর্যে প্রাধান্য ছিল কোমলতা, লাবণ্য ও কমনীয়তা।

প্রিয় নবীজীর অনুপম সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে সাহাবী হযরত হাসসান ইবন সাবিত (রা.) বলেছেন-

আপনার (সা.) মত সুন্দর মানুষ
চক্ষু আমার হেরেনি কভু,
আপনার মত সুশ্রী সন্তান-
কোন মা প্রসব করেনি আজো।
যেভাবে চেয়েছেন জন্মেছেন সেভাবে
সকল ক্রটির উর্ধ্বে তব।

এসব বর্ণনা থেকে স্পষ্টই প্রতিভাত হয়, প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর চাইতে সুন্দর ও লাবণ্যময় কোন মানুষ আজ পর্যন্ত সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং পার্থিব, দেহ সৌন্দর্যের ভিত্তিতে কাউকে ভালোবাসতে হলে সে আমার কামলিওয়ালা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেই ভালোবাসতে হবে!

মূলত আল্লাহ তাআলা চাচ্ছেন মানুষ তার প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রাণ নিংড়ে ভলোবাসুক। তাই ভালোবাসার সকল উৎস, সকল উপকরণের এক অপূর্ব অনুপম সমন্বয় ঘটিয়েছেন তিনি তাঁর প্রিয় রাসূলের জীবনে। যার আক্ষরিক ব্যাখ্যা দেবার, ভাষা শব্দে প্রশংসা করার শক্তি নেই, ক্ষমতা নেই। বরং আত্মসমর্পণ করে বলতে হয় সকলকেই-

জানিনা কেমনে গাহি তব গুণ
ভাবিয়া নাহিকো পাই,
যত গেয়ে যাই দেখি তব বহু
উর্ধ্বে তোমার ঠাঁই-

সকল সুন্দরের শৈল্পিক সমন্বয়ে সুশোভিত করেছেন প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে। যেন পৃথিবীর সকল মানুষ তার প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত আবেদনেই তাঁকে ভালোবাসেন। কারণ, তাঁকে ভালোবাসতে না পারলে তো মানুষ তাঁর সে আদর্শে রেঙে উঠতে পারবে না, যে আদর্শ আল্লাহ প্রদত্ত ও বিশ্বমানবের একমাত্র মুক্তি সনদ। তাঁকে ভালো না বাসলেতো তাঁর প্রতি পুর্ণাঙ্গ ঈমানও আনা যাবে না। অথচ তাঁর প্রতি ঈমান আনা ছাড়া কেউ মুক্তি পাবে না সফলকাম হতে পারবে না। তাইতো ইরশাদ হয়েছে কুরআনের ভাষায়।

www.almodina.com

'যারা ঈমানদার, আল্লাহ প্রেমে তারা অধিক অগ্রগামী।' (বাকারা : ১৬৫)

আরো ইরশাদ হয়েছে-

'(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, তোমাদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই, স্ত্রী-পরিবার, উপার্জিত সম্পদ, ব্যবসা যাতে মন্দা পড়ার আশংকা কর, এবং বাসস্থান যা তোমাদের খুবই মনঃপূত- এসব যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তুলনায় এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের তুলনায় অধিক প্রিয় হয় তাহলে আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। অবাধ্য সম্প্রদায়কে আল্লাহ হেদায়েত দান করেন না।' (তাওবা : ২৪)

আলোচ্য আয়াত দু'টির সারমর্ম এটাই, একজন মুমিনের দৃষ্টিতে সর্বাধিক প্রিয় সত্তা হবেন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ঘর-সংসার, আত্মীয়-পরিজন, ধন-সম্পদ কোন কিছুই যেন এ পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে- এটাই হবে একজন মুমিনের জীবনে প্রত্যয় অঙ্গীকার।

এ সুবাদে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার মা-বাবা, ছেলে সন্তান ও অন্য সকলের চাইতে অধিক প্রিয় ব্যক্তি না হই।' একটি হাদীসে আছে, একথা শোনার পর হযরত উমর (রা.) বললেন- হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনাকে সকলের চাইতে বেশী ভালোবাসি, আমার হৃদয়ে আপনার চেয়ে প্রিয় আর কেউ নেই। তবে আপনি আমার জীবনের চাইতে বেশি প্রিয় নন। জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, না উমর! তাহলে তো আর হলো না। অর্থাৎ তুমি তোমার জীবনের চাইতে যদি আমাকে অধিক ভালোবাসতে না পার তাহলেতো তোমার ঈমান পূর্ণ হবে না। তুমি পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না। এবার একটু থেমে গাঢ় গভীর বিশ্বাসদীপ্তকণ্ঠে উমর (রা.) বললেন- হ্যাঁ, রাসূল! আপনি আমার কাছে আমার জীবনের চাইতেও বেশি প্রিয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- হ্যাঁ, এখন হয়েছে উমর!

বক্ষমান বর্ণনা ও পূর্বোক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে স্বষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে, প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসা ঈমানের শক্তিশালী অংশ। এ অংশ ব্যতিরেকে কোন মানুষ ঈমানদার হতে পারবে না। এর পেছনেও শরীয়তের বোধগম্য কারণ ও দর্শন রয়েছে। আর তাহলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন তাঁকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুসরণের জন্যে। মূলতঃ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসার প্রকৃত আবেদনতো এটিই।

www.almodina.com

আজকাল আবার আমাদের সমাজে এ নিয়ে খুব বেশি প্রান্তিকতা চলছে। নবীপ্রেমের আবশ্যিকতা সকলেই স্বীকার করেন। মুসলমানমাত্রই বিশ্বাস করেন, কোন মুসলমান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসবে না, এতো হতেই পারে না! তবে সে ভালোবাসার স্বরূপ কি হবে, নবীজীর প্রতি প্রেম নিবেদনের প্রক্রিয়া কি হবে এই নিয়ে বেশ বাড়াবাড়ি নজরে পড়ে আমাদের দেশে। এক শ্রেণীতো নবীজীর প্রতি ভালোবাসা নিবেদনে এতটা বেশামাল যে শরীয়তের আইন-কানুন পর্যন্ত মানতে নারাজ। বরং ইসলামের নীতি নির্দেশের তোয়াক্কা না করে যখন যা ইচ্ছে হচ্ছে যেভাবে মন চাচ্ছে সেভাবেই নবীজীর প্রশংসা করছে। প্রশংসা করতে গিয়ে যে নবীকে আল্লাহর আসনে ঠাঁই দিচ্ছে এদিকে যেন পরোয়া নেই, লক্ষ্য নেই। আল্লাহর বিশেষ গুণাবলী নবীর সাথে সম্পৃক্ত করার স্পষ্ট অপরাধ ও শিরক কর্মকেই নবীজীর প্রতি গভীর নিদাগ ভালোবাসা ভেবে আনন্দে আহ্লাদিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে আরেক দল, ধর্ম-কর্মে এতটা রসহীনতায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে যে, নবীজীর ভালোবাসায় রাসূলের মহব্বতে বিগলিত হৃদয়ে দরুদ, সালাম পাঠ করাতো দূরের কথা নবীজীর অকাট্য সুন্নত দাড়ি রাখতে পর্যন্ত নারাজ। রাখলেও নবীজীর তরীকায় নয়, গানশিল্পী এন্ড্রোকিশোরের তরীকায়। তাদের দৃষ্টিতে ইসলামের দুর্দম কাফেলার বীর সৈনিকদের মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে ওসব দাড়ি কোর্তার প্রয়োজন হয় না। আর টুপি কিংবা সুন্নতী পোশাক সেকথা বললে তো চটে উঠে তেড়ে আসবে এই বলে, ওসব দাড়ি টুপীর নাম কি ইসলাম?

প্রকৃতপক্ষে এর কোনটিই নবীপ্রেমের স্বরূপ নয়। সুতরাং নবীপ্রেমের অপরিহার্যতাকে যারা স্বীকার করেন, দীন ধর্মের দোহাই যারা মানেন, তাদের সমীপে কুরআন ও হাদীসের আলোকেই নবীজীর প্রতি ভালোবাসার স্বরূপ তুলে ধরা অধিক সমীচীন মনে করি।

এ সম্পর্কে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- 'যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে বাস্তবায়িত করল সে নিশ্চয়ই আমার প্রতি ভালোবাসা নিবেদন করলো আমাকে ভালোবাসলো। আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসলো সেতো কিয়ামতের দিন আমার সাথে বেহেশতে অবস্থান করবে।' অন্য একটি বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- 'তোমাদের কেউ মুমিনই হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমাদের প্রবৃত্তি প্রাকৃতিক কামনা আমার আনীত আদর্শের অনুসারী না হবে।'

বর্ণনা দু'টির সার কথা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত ও আদর্শের অনুসরণ মানেই হলো হুযুরের প্রতি ভালোবাসা স্থাপন করা। আর

www.almodina.com

এর অনুসরণ, রাসূলের সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য ছাড়া মুমিনই হওয়া যাবে না। সুতরাং একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতের অনুসরণই হলো তাঁর প্রতি ভালোবাসা। আর সুন্নত? সে তো একটি ব্যাপক শব্দ। সুন্নত বলতে বুঝায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করতে বলেছেন, যা নিজে করেছেন এবং যেসব কাজ তাঁর সামনে সংঘটিত হয়েছে এবং তিনি তা প্রত্যক্ষ করেছেন অথচ প্রতিবাদ করেননি, এসবই সুন্নত। এক কথায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শকেই সুন্নত বলা যায়। এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে- 'রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তা আঁকড়ে ধর, আর তিনি যা করতে নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর।' রাসূলের এ নিঃশর্ত আনুগত্যের নামই ঈমান, এরই নাম সুন্নতের অনুসরণ। যারা এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কদমে কদমে অনুসরণ করে তারাই সত্যিকার অর্থে নবীপ্রেমিক। তাই একথা আর আলাদা করে বুঝাবার অপেক্ষা রাখে না যে, নবীজীর দেয়া শরীয়তের কুরআন হাদীসের ছক কাটা রীতি-নীতি লংঘন করেও কেউ আশেকে রাসূল বা নবী প্রেমিক হতে পারবে না। আবার ইসলামী লেবাস তরীকতের প্রতি অবজ্ঞার হাসি হেসে, দাড়ি টুপিকে উপেক্ষা করেও নবীজীর মিছিলে শরীক হতে পারবে না কেউ। হতে পারবে না নবীজীর ভালোবাসার সুউচ্চ আসনে সমাসীন। বরং তাঁকে ভালোবাসতে হলে তাঁর আনুগত্য করতে হবে ফরযে, ওয়াজিবে, সুন্নতে, ঘরে-বাইরে সবর্ত্র। এর প্রতিদানও প্রচুর। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে- 'আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন সে তাদের সাথী হবে।' (সূরা নিসা। ৬৯)

বক্ষমান আয়াতটির ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত তাফসীরবিশারদ মুফতী শফী (রহ.) লিখেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার জিজ্ঞেস করা হল, 'সে লোকটির মর্যাদা কেমন হবে যে লোক কোন জামাত বা দলের সাথে ভালোবাসা পোষণ করে, কিন্তু আমলের বেলায় এদলের নির্ধারিত মান পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- 'হাশরের মাঠে প্রতিটি লোকই যার সাথে তার ভালোবাসা, তার সাথেই থাকবে।'

সাহাবী হযরত আনাস (রা.) বলেন- পৃথিবীতে কোন কিছুতেই আমি এতটা আনন্দিত হইনি যতটা এ হাদীসের কারণে আনন্দিত হয়েছি। কারণ, এ হাদীসে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যাদের গভীর ভালোবাসা রয়েছে, তাঁরা হাশরের মাঠেও হুযুরের সাথেই থাকবেন। আর আমরা পূর্বোক্ত হাদীসে পেয়েছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

www.almodina.com

'আমার সুন্নতের বাস্তবায়ন যে করল সে আমাকে ভালোবাসলো। আর আমাকে যে ভালোবাসবে সে তো কিয়ামতের দিন আমার সাথে বেহেশতে থাকবে।'

একজন মুমিনের জীবনে এর চাইতে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে? সত্যিই নবীপ্রেম যেমন অনুপম সম্পদ, তার পুরস্কারও অনুপম বর্ণনাতীত। কিয়ামতে বেহেশতে হুযুরের সঙ্গ পাওয়ার চেয়ে বড় প্রত্যাশা আর কি হতে পারে?

এতবড় পুরস্কার ঘোষিত হবার পরও যারা প্রিয়তম রাসূলের ভালোবাসায় উদ্বেলিত হতে পারে না, নবীপ্রেমের স্নিগ্ধ রৌশনীতে জীবন যাদের ভাস্বর হয়ে উঠে না, অস্তিত্বে যারা নবীজীর মহব্বতের প্রতি অনুরাগ অনুভব করে না তারাতো প্রকৃতপক্ষেই হতভাগা। তাই তাদের প্রতিদানও বড় কঠোর।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতের অনুসরণের নামই যেহেতু নবীপ্রেম। আর এর বিরোধিতা ও বর্জনের নামই যেহেতু নবীদ্রোহিতা, তাই সে দ্রোহিতার প্রতিফলের কথা ঘোষিত হচ্ছে প্রিয় নবীজীর ভাষায় এইভাবে-

'যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে বিনষ্ট করে দিল,
তার জন্যে আমার শাফায়াত হারাম।'

বলাবাহুল্য, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শাফায়াত ছাড়া কি কেউ নাজাত পেতে পারবে? যদি পার না পাওয়া যায় তাহলে সময় থাকতেই ভেবে দেখতে হবে। কার্যকর শপথ নিতে হবে।

সবশেষে ইতিহাসে স্বর্ণের হরফে লেখা এক আল্লাহপ্রেমিকা, নবী প্রেমে চিরসিক্তা তাপসী হযরত রাবিয়া বসরীর (রা.) অনুভূতির প্রতিধ্বনি করেই রচনার ইতি টানতে চাই। তিনি বলেন-

মুখে বল আল্লাহকে ভালবাসি, আর-
কার্যত অবাধ্য তাঁর,
এটা নিঃসন্দে যুক্তিহীন
এটা অপাংক্তেয় উক্তি তোমার!
সত্যি যদি বাসতে ভালো
মানতে তুমি খোদার কথা
প্রেমিক যত প্রেমাস্পদের
অনুগত হয় যে সদা।

আমরাওতো দাবী করি, আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি, ভালোবাসি প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। কিন্তু বাস্তবেও কি সে ভালোবাসার আবেদন অনুধাবন করতে পেরেছি আমরা? আমরা সে ভালোবাসার একটি বাস্তব ছবি কি আঁকতে পেরেছি আমাদের জীবন পাতায়? কামনা করি সেই চেতনাই দীপ্ত হয়ে ওঠুক আমাদের ভাবনায়- সমুহ কর্মধারায়। আমীন॥

www.almodina.com

মসজিদ : নববী মিশনের প্রাণকেন্দ্র

আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবী সৃষ্টি করার পর সর্বপ্রথম নির্মাণ করেছেন তাঁর ঘর বাইতুল্লাহ। বাইতুল্লাহ-ই এই মাটির পৃথিবীর প্রথম ঘর। এমর্মে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন- মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর নির্মিত হয়েছে মক্কায় সে ঘর খুবই বরকতপূর্ণ ও বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াত ও পথনির্দেশনাস্বরূপ। অর্থাৎ মানব জাতির জীবন পথের দিশা, বিজয় ও সফলতার দিক-দর্শন, জীবন ও স্বপ্নের মূল কেন্দ্র হবে এই ঘর। এই ঘরকে ঘিরেই আবর্তিত হবে তার ইচ্ছা, স্বপ্ন, সাধ, সাধনা ও সকল কর্ম-প্রচেষ্টা। এই সূত্রেই গ্রথিত হবে তার মন চিন্তা কর্ম পরিকল্পনার সকল আয়োজন। পৃথিবীময় সকল বান্দা ও অনুগত মানবমন্ডলী এই একই বিন্দুকে ঘিরে নিবেদন করবে মহান মালিকের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা, আনুগত্য ও ইবাদতের অলৌকিক অনুভূতি। এক আল্লাহর প্রভুত্ব ও রাজত্বের তাওহিদী আলোয় দীপ্ত হয়ে উঠবে মাটির ধরা!

পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠিত সকল মসজিদই মূলত এই একই লক্ষ্যে নিবেদিত। এই একই বিন্দুকে ঘিরে একত্ববাদের খোদায়ী রাজত্ব প্রতিষ্ঠাই সকল মসজিদের প্রাণকথা। তাই মসজিদ হলো আবদ ও মা'বুদ, খালিক ও মাখলুক, প্রতিপালক ও প্রতিপালিত, বিধানদাতা ও বিধানানুসারী এবং মনিব ও দাসমন্ডলীর সম্পর্কের প্রাণকেন্দ্র। এই প্রাণকেন্দ্রে এসেই প্রভুর প্রতি বান্দা তার আনুগত্য, গোলামী আর প্রেমময়তার প্রাণ খুঁজে পায়। পথহারাজনরা খুঁজে পায় পথের সন্ধান।

মসজিদ : প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে

আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ থেকে আজ অবধি পৃথিবী জুড়ে মুসলিম উম্মাহর গঠন, সংশোধন, নির্মাণ-পরিশোধন, তাদের চারিত্রিক, আত্মিক, সামাজিক ও প্রভুর প্রতি দাসত্ব ও আনুগত্যের মাত্রাকে উচ্চতর নিক্তিতে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মসজিদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। সবিশেষ হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে।

এটা সর্বজনবিদিত, হিজরতপূর্বকালে ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থা ছিল পূর্ণ অস্থিরতায় কম্পমান। তাই সুনির্ধারিত পরিকল্পনা, ধারাবাহিক রুটিন ও

www.almodina.com

কর্মসূচি এবং সুশৃংখল পরিচালনার মাধ্যমে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সুযোগ লাভ করেননি। অতঃপর যখন মদীনায় এলেন প্রথমেই গড়ে তুললেন আল্লাহর ঘর মসজিদ, ইতিহাসের মসজিদে নববী। তারপর শুরু হলো সুশৃংখল ধারাবাহিক পথ চলা এবং এই মসজিদকে কেন্দ্র করেই।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চারপাশে সমবেত সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর দীনি চিন্তা, চরিত্র সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হিসাবে নির্বাচন করেন এই মসজিদকেই। এই মসজিদেই তিনি সাহাবায়ে কেরামকে কুরআন সুন্নাহ ও হিকমত শিক্ষা দিতেন। আত্মশুদ্ধির আলোকিত পাঠদান করতেন এই মসজিদের কংকর বিছানো পাটাতনে বসেই। এখানে বসেই শিক্ষা দিতেন সমাজ জীবনের খুঁটিনাটি সকল বিষয়। খানা-পিনার আদব-কায়দা থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনার সুউচ্চ চূড়া প্লাবিত করে প্রস্রাব-পায়খানার নিয়মনীতি পর্যন্ত বিস্তৃত হতো সেই পাঠ।

মসজিদের পবিত্র প্রাঙ্গণে বসেই তিনি রোম পারস্য মিসর ইয়েমেন হিরা ও বাহরাইনসহ সমকালীন রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে পত্র প্রেরণ করতেন। আবার এই মসজিদ-ই ছিল মদীনার প্রধান প্রতিরক্ষা দফতর। মসজিদের সম্মুখ চত্বরেই সৈনিকদের প্রশিক্ষণ মহড়া হতো। যুদ্ধের শলা-পরামর্শ বসতো নবীজীর মসজিদে। মিম্বর ছুঁয়ে বিরাজ করত তাঁর পবিত্র অস্তিত্ব। তাঁকে ঘিরে সুবিনীত কণ্ঠে পরামর্শ দিতেন যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ সাহাবীগণ। গোত্রপতিরাও শালিন শোধিত কণ্ঠে অভিমত ব্যক্ত করতেন। কখনো বা তারুণ্যের তরঙ্গায়িত জোশ আছড়ে পড়তো সকল মৌনতাকে পরাজিত করে। তিনি সব শুনে ফয়সালা দিতেন। সময়ে এই মসজিদে দাঁড়িয়েই যুদ্ধের জন্য চাঁদা আদায় করতেন। তহবিল গঠন করে অস্ত্র ক্রয় করতেন এবং এখান থেকেই শুরু হতো মুজাহিদীনের যুদ্ধ-যাত্রা।

স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র বিষয়ে পরামর্শে বসতেন এখানেই। মদীনার ভেতর এবং বাইরের সার্বিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ হতো এখানে বসেই। এই মসজিদই ছিল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয়- সুপ্রিম কোর্ট। এখানেই সমাজে নির্যাতিত বঞ্চিতগণের প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা হতো। ফরিয়াদীর আর্জি শোনা হতো পূর্ণ ধীরতা ও সহিষ্ণুতার সাথে। অত্যাচারীদের প্রতি দন্ডবিধি কার্যকর করা হতো। আবার এই মসজিদের বিশেষ স্থানেই বসতো 'মুহাম্মদী দারুল উলূমের' শিক্ষাসভা। যেখানে পাঠদান করতেন স্বয়ং মুহাম্মদে আরাবী (সা.)। আসহাবে সুফফার সম্মানিত সদস্যগণ যার প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থী।

এক কথায়, উভয় জাহানের কল্যাণ ও বিজয়, সমাজ জীবনের সার্বিক

www.almodina.com

পথনির্দেশ, মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রের পরিপূর্ণ সুবিস্তৃত ও অতল স্পর্শী শাশ্বত চিরন্তন অপরিবর্তনীয় যে জীবন শিক্ষা নিয়ে আগমন করেছিলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিপূর্ণ দাওয়াত, নির্দেশনা, বিশ্লেষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আয়োজন ও বাস্তবায়ন ঘটেছে এই মসজিদে ইসলামের নূরময় জীবন দর্শনে দাওয়াত, শিক্ষাও বাস্তবায়নের প্রাণকেন্দ্র ছিল মসজিদ। তিলাওয়াত, যিকির, তালীম, সালাত থেকে শুরু করে যুদ্ধ বিচার পর্যন্ত সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হতো এই মসজিদ থেকেই। বান্দার তরে প্রদত্ত মহান মালিকের যাবতীয় হুকুম-নির্দেশ, আইন-বিধান, প্রদত্ত আদর্শ সভ্যতা, আদব ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণ তালিম শিক্ষা ও রূপায়ণের যথাযথ ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রণ হবে মালিকেরই ঘর মসজিদ থেকে এইতো স্বাভাবিক। আর সেই স্বাভাবিক পথ ও পদ্ধতিতেই অগ্রসর হয়েছেন প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ফলও পেয়েছেন সরল সুন্দর বর্বর আদর্শ বিচ্যুত দস্যু আরবরা পরিণত হয়েছেন সোনার মানুষে। নির্যাতিতের ক্রন্দন ধ্বনি আর শুনতে হয়নি আকাশকে। জালিমের বীভৎস হুংকার, পাষাণ লোভীদের দানবী থাবায় আর কাঁপেনি মর্তলোক। কারণ, আল্লাহর দুনিয়া চালিত হয়েছে আল্লাহ'র ঘরকে কেন্দ্র করে।

মসজিদ : খোলাফায়ে রাশেদার যুগে

নবুওয়াতকাল সমাপ্ত হতেই শুরু হয় খিলাফতকাল এবং এই খিলাফত ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনার প্রথম বৈঠক তথা খলীফা নির্বাচনও হয় এই মসজিদেই। হযরত (সা.) যেখানে দাঁড়িয়ে নামাযে ইমামতি করতেন, করতেন নবী ও রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব পালন, হযরত আবু বকরও ঠিক একই ছন্দে, একই পদ্ধতিতেই নামায থেকে রাষ্ট্রপরিচালনা পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রের নির্দেশনা পরিচালনা করেন ঠিক একই স্থান থেকে। মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজ নির্মাণের ধারা বহতা নদীর মতো এগিয়ে চলে শহরের পর শহর প্লাবিত করে।

খলীফা হবার পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এই মসজিদে দাঁড়িয়েই সর্বপ্রথম মুরতাদ ধর্মত্যাগী ও যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। ভন্ডনবী মুসাইলামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেন এই মসজিদে বসেই। মুসলমানদের দীনি, সামাজিক, রাজনৈতিক, দাওয়াতি, জিহাদী, অর্থনৈতিক এবং যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষার সকল বিষয়ই আলোচিত ও মিমাংসিত হতো এই মসজিদেই। যেমনটি হতো হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আলোকিত আমলে। তাই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলে সূচিত সোনার সমাজ ধীরে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে, মানবিক গুণাবলী ও সৌন্দর্যের ধারা বয়ে চলেছে আরও সম্মুখ পানে বিজয়ের ধারার

www.almodina.com

সঙ্গে। ইতিহাসের কিংবদন্তি শাসক হযরত উমর (রা.)ও অর্ধজাহান শাসন করেছেন এই মসজিদে মাটির চাটাইয়ে বসেই অর্ধজাহানের অমিত তেজ শাসক সমাসীন মসজিদের ধুলির আসনে। আর সমকালীন রুম পারস্য আর মিসর আফ্রিকার প্রতিনিধিরা এসে অবনত বিশ্বাসে অবলোকন করেছেন এই শীতল সুন্দর দৃশ্য মসজিদের ভেতরে যেমন বড় ছোট আর ধনী গরীবের ভেদাভেদ নেই, নেই সাদা কালোর ফারাক, বরং এক আল্লাহর দাস হিসাবে সকলেই সমান, সকলেই ভাই ভাই। ভ্রাতৃত্ব ও সমতার এই অলৌকিক চরিত্র মসজিদ থেকে বরং আরব ভূমিকে প্লাবিত করে আজম রাজ্য পর্যন্ত ছুঁয়েছে, সব দিকে ঢেউ ও হিল্লোল বয়ে গেছে ইসলামের- মূলত এসবই ছিল সেই মসজিদকেন্দ্রিক জীবন বিশ্বাসের ফসল। যার নয়নকাড়া হৃদয়গ্রাহী চিত্র এখনো আমরা মসজিদের ভেতর প্রতিনিয়ত অবলোকন করি আর মসজিদের বাইরে তারই অনুপস্থিতিতে ঝলসে মরি, জ্বলে পোড়ে ছাই হই।

ইসলাম ও মুসলমানদের দুর্দিনের বন্ধু, হযরত উসমান যিন-নূরাইন (রা.) মসজিদে নববীর ধুলির আসনে বসেই সিন্ধু ও কাবুলের উদ্দেশ্যে মুজাহিদিনের বাহিনী পাঠান। নববীদর্শন ও সভ্যতার আদলে পরিচালনা করেন এতীম উম্মাহর জীবন সংসার।

অতঃপর সায়্যিদুন হযরত আলী মুরতাযা (রা.)ও যখন খলীফা হন তখন তিনি ইমামও হন মসজিদের। তিনি যেভাবে জুমুআর নামাযের পূর্বে ভাষণ দিতেন মসজিদের মিম্বরে ওঠে, তেমনি মুসলমানদের জরুরি ও জনগুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর সমাধানও দিতেন ওই মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়েই। দীন ও দুনিয়া উভয় জগতের পরিপূর্ণ নির্দেশনায় সমৃদ্ধ হতো তাঁর বক্তৃতামালা এবং সকল প্রকার কর্মকান্ডের কেন্দ্রভূমি হিসাবে বিবেচিত হতো এই মসজিদ। তাই অবশেষে তিনি শহীদও হন মসজিদের মিম্বরেই, যেমনটি হয়েছিলেন হযরত ফারুক আযম (রা.)।

মসজিদ : খোলাফায়ে রাশেদার পর

ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন, একটা সময় ছিল যখন যিনি দেশের ইমাম হতেন তিনিই সে দেশের প্রধান মসজিদেরও ইমাম হতেন। যিনি নামাযে নেতৃত্ব দিতেন তিনিই সমাজের নেতৃত্ব দিতেন। আর সে সময়টাই ছিল মূলত উম্মাহর গৌরবকাল। নববী দর্শনের আদলে নির্মিত উসওয়াতুন হাসানার আলোকে প্রতিষ্ঠিত সেই কালে সমাজে বিরাজ করতো মসজিদের সৌম শান্ত সুনিবিড় পরিবেশ। মুসুল্লীগণ যেভাবে ইমামকে অনুসরণ করে বিনাবাক্যে তেমনি সমাজের প্রতিটি নাগরিক মেনে চলতো শাসকের কথা ইতিহাসের সে এক স্বর্ণকাল।

www.almodina.com

খোলাফায়ে রাশেদার পর এ অবস্থা খুব বেশি দূর এগোয়নি; বরং ইমামতি ও নেতৃত্ব বিভক্ত হয়ে পড়েছে পূর্ণ দুই শিবিরে যারা জনতার ইমাম তারা মসজিদ থেকে বিচ্ছিন্ন আর মসজিদের ইমামগণ বিচ্ছিন্ন জনতা থেকে আম জনতা থেকে। অবশ্য বিচ্ছিন্নতার প্রভাতকালেই যে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল কর্মমুখর মসজিদবিপ্লব তা কিন্তু নয়; বরং মুসলিম শাসকদের আমলেই যাঁরা ছিলেন মসজিদ ও জনতার ইমাম তাদের যুগেই প্রতিটি মসজিদকে গড়ে তোলা হয়েছিল জীবন্ত সমাজ কেন্দ্ররূপে। আদর্শ নাগরিক গঠনের দীপ্ত প্রত্যয়ে বলীয়ান ছিল প্রতিটি মসজিদ।

এই বাগদাদের কথাই ধরা যাক। হযরত আলী (রা.) এখানে রাজধানী পাতার পূর্বেই হযরত উমর ফারুক (রা.) কুরআন হাদীসে বিদ্যান সাহাবীগণকে প্রেরণ করেন এই বাগদাদে সুবিখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) সহ জ্ঞানাধার সাহাবীগণ এখানে এসে গড়ে তুলেন মসজিদ কেন্দ্রিক বিশাল বিশাল পাঠশালা। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের পরিপূর্ণ প্রমাণসিদ্ধ তালিম হতো এসব বিদ্যানিকেতনে। ইতিহাসের বাতিঘর ইমাম আযম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ, হযরত হাসান বসরী, হযরত সুফয়ান সাওরী, ইমাম আওযাঈ, ইমাম লাইছ সা'দ মিসরী, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার, ইমাম হাসান ইবন যিয়াদ প্রমুখ মনীষী তো এসব মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রেরই সোনালী ফসল। যাঁদের জ্ঞান গবেষণাকে উপেক্ষা করে আজো উম্মাহর কোন ব্যক্তি, কোন গোষ্ঠী কিংবা কোন দেশ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কথা কল্পনাও করতে পারে না।

সেই সাথে এও স্মরণ করা প্রয়োজন, পৃথিবীবিখ্যাত মনীষী ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ, আবদুল্লাহ ইবন মুবারক, ইবন হাজার আসকালানী, আল্লামা আইনী, আল্লামা কাসতালানী, আল্লামা শাওকানীর মতো হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রের সম্রাটগণও এই মসজিদ কেন্দ্রিক বিদ্যালয়েরই ফসল।

যদি খুব নিকটকালের উপমা দিই তাহলেও বলতে পারি, আমাদের এই ভারত বর্ষের যখন (১৮৫৭ ইং) পতন হলো, গোলামির কালো ছায়া যখন গ্রাস করে নিল আমাদের স্বাধীন বিশাল ভারতভূমি, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শ্বেত ভল্লুকদের নখর থাবায় যখন ক্ষণে ক্ষণে রক্তাক্ত হচ্ছিল স্বদেশী দেশ-প্রেমীদের রক্তে মাতৃভূমি, জাতির আশার আলো আলিম সমাজ যখন হয়তো যাচ্ছিলেন নির্বাসনে নয়তো ঝুলছিলেন গাছের ডালে ফাঁসির রশিতে, দেশ ও জাতির এ ভয়ংকর দুর্দিনে আযাদী ও স্বাধীনতার অবিনাশী স্বপ্নে বীর মুজাহিদ নির্মাণের যে দীপ্ত পাঠশালা 'দারুল উলূম দেওবন্দ' নামে প্রতিষ্ঠিত হয় তারও সূচনা হয়েছিল

www.almodina.com

ঐতিহাসিক ছাত্তা মসজিদ প্রাঙ্গণেই। তাই বলতে পারি, রেশমী রুমাল আন্দোলনের বীর নায়ক শাইখুল হিন্দ মাহমূদ হাসান, চিরবিপ্লবী উবাইদুল্লাহ সিন্ধি, মহান দাঈ ইলিয়াস কান্ধালবী, সংগ্রামী নেতা হিফযু রহমান সিওহারবী, আপসহীন রাজনীতিক হুসাইন আহমাদ মাদানী, তাসাউফ জগতের ইমাম আশরাফ আলী থানবী প্রমুখ মনীষী এই ছাত্তা মসজিদেরই সোনাঝরা ফসল।

আমাদের মসজিদ এবং নবীজীর মসজিদ

আমাদের মসজিদ বলতে বর্তমানকালের মসজিদগুলোর কথাই বলতে চাচ্ছি। একথা পূর্বেই আলোকপাত করেছি, মসজিদকেন্দ্রিক সমাজ পরিচালনার ঐতিহ্য খোলাফায়ে রাশেদার পর খুব বেশিদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়নি। সেই সাথে অভিজ্ঞতার আলোকে এও বলতে পারছি, ব্যক্তি গঠনের আলোকিত ধারায়ও আমাদের দেশের মসজিদকেন্দ্রিক অবদান খুবই গৌণ। সোনার গাঁয়ের শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (রহ.)-এর মসজিদ কেন্দ্রিক হাদীস চর্চার আন্দোলনকে বাদ দিলে আমাদের এই অঞ্চলে আর উল্লেখযোগ্য উপমা পাওয়া খুবই মুশকিল।

তবুও আশা জাগে

তবুও আশা জাগে এই কারণে, বর্তমানে যখন মসজিদের ইমাম আর সমাজের নেতাজনদের মধ্যে যোজন যোজন দূরত্ব, সেই ইমাম ও মুসল্লী এবং মসজিদ ও সমাজের মাঝে আকাশ পাতাল ব্যবধান তখনও আমরা লক্ষ্য করি বিভিন্ন ধর্মীয় ইস্যুতে ইমামদের ডাকে মুসুল্লীদের সাড়া দিতে, কোথাও কোথাও দস্তুরমত পথে নেমে আসতে। আমরা আরও দেখি, সবিশেষ শুক্রবারে জুমুআর পূর্ব ভাষণে মুসুল্লীদের সযত্ন শ্রবণ দৃশ্য। দেখি, তারা নামাযের পর মসজিদের মিম্বর থেকে প্রদত্ত মাননীয় ইমাম ও খতীবদের আলোচনার পর্যালোচনা করছে; কখনো বা সে আলোকে নিজেদের এবং সমাজের অন্যায় অপরাধের কথা অকপটে স্বীকার করছে। এ পরিবেশ নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক

লক্ষণীয়, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে ইসলামকে সামগ্রিক জীবনের একমাত্র দিশারী রূপে উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন সেটা আমাদের সমাজে শুরু থেকেই হয়নি ফলে সমাজের মুসলিম নাগরিকগণ শুরু থেকেই সর্বাঙ্গীনভাবে ইসলামের সাথে নিজেদের জীবনধারাকে একাত্ম করে নিতে পারেননি যেভাবে পেরেছিলেন প্রথম যুগের ভাগ্যবান মুসলমানগণ। তাই মসজিদ, ইসলাম, নবী, কুরআন ইত্যাকার মৌলিক বিষয়ের সাথে তাদের সম্পর্ক যা গড়ে উঠেছে তা খন্ডিত, অপূর্ণাঙ্গ।

আশার আরেকটি কারণ হলো, এ দেশের মানুষের মধ্য ধর্মের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল সর্বকালে এবং এখনও আছে। তাই হতাশার অক্টোপাস ছিন্ন

www.almodina.com

করে আমাদের মসজিদগুলো হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত মিশন ও জীবন-বিধানের কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলতে হলে যেভাবে আবাদ করে তুলতে হবে আমাদের মসজিদগুলোকে তাহলো-

১. প্রথমে মসজিদ কমিটির সম্মানিত সদস্যগণকে বোঝাতে হবে, মসজিদ শুধুই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের স্থান নয়; মসজিদ হলো মুসলিম সমাজের পরিচালনা কেন্দ্র।

২. শুক্রবারের বয়ান ছাড়াও সপ্তাহে অন্তত দু'বার দরসে কুরআন ও দরসে হাদীসের আয়োজন করতে হবে। জীবনব্যাপী ইসলামী জীবনদর্শনের কল্যাণ ও যৌক্তিকতা ও তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকারিতা তুলে ধরতে হবে।

৩. বিশেষ করে সমাজের যুবক শ্রেণীকে ধর্মীয় জ্ঞান ও দর্শনে বিশ্বাসী করে সেটাকে সমাজের কল্যাণে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে মসজিদ ভিত্তিক পাঠাগার স্থাপনও একটি জরুরি বিষয়।

৪. এবং সব কিছুর পূর্বে বুদ্ধি যুক্তি ও জ্ঞান পান্ডিত্যে সমাজকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের মতো গভীর অধ্যবসায় ও সাধনা করতে হবে মসজিদের সম্মানিত ইমাম সাহেবদের। মসজিদের ইমামতি থেকে সমাজের ইমামতি পর্যন্ত নিজেকে ব্যাপ্ত করতে হবে পূর্ণ প্রস্তুতি ও আস্থার সাথে।

আজ যখন দিকে দিকে পতনের হাহাকার, পরাজয়ের গ্লানি ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ছে না, তখনতো সেই নিশ্চিত বিজয় উত্তরণ ও সফলতার পথেই ফিরে যেতে হয়। সন্দেহ নেই মসজিদ কেন্দ্রিক জাগতিক এই পয়গাম আমাদের হারানো সেই গৌরবময় অতীতের কাছে পৌঁছে দেবে যেখানে একদা আমরা ছিলাম খুবই সম্মানিত পৃথিবীর পরাশক্তিরা আমাদের সমীহ করে কথা বলত আর আমরা সমীহ করতাম কেবল আল্লাহকে।

www.almodina.com